স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ২৫ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩।। ১৩ ফাল্গুন - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খারাপের থেকে আরও খারাপের দিকে যাওয়াটাও পরিবর্তন ▯ ৯

প্রসঙ্গ নরেন্দ্র মোদী : নীতিশ কুমার ভাবুন একবার ▯ তারক সাহা ▯ ১০

দিল্লীর শ্রীরাম কলেজে নরেন্দ্র মোদীর অবিস্মরণীয় বক্তৃতার তাৎপর্য ▯ তথাগত রায় ▯ ১১

নারী স্বাধীনতার চেয়ে নারী সম্মান রক্ষাই ভারতীয় সংস্কৃতি ▯ এন সি দে ▯ ১৪

পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাব রুখতে না পারলে ধর্ষণ মহামারীর আকার ধারণ করবে ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৬

রাধাকান্তপুরে দাসেদের গোপীনাথ মন্দির ▯ ডঃ প্রণব রায় ▯ ২১

হিন্দু পুরাণ ও মহাপুরুষের জীবনে সারমেয় ▯ নীতিন রায় ▯ ২২

খোলা চিঠি : আমায় বদলি করবেন না প্লিজ

ঘরে বউ-বাচ্চা আছে ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ২৭

বর্বর পাকিস্তানকে নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছি ▯ জয় দুবাসী ▯ ২৮

বাংলাদেশের ঘাঁটি থেকে ভারতে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদ ▯ ৩০

বিভিন্ন রাজ্যে ছোট ছোট মুসলিম দল জোট বাঁধছে ▯ ৩১

অন্য হিটলার ▯ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী ▯ ৩২

যাত্রা উৎসব : দু-চার কথা ▯ বিকাশ ভট্টাচার্য ▯ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ ▯ ভাবনা-চিন্তা : ২০ ▯ ▯ বোধন : ২৩ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯

অঙ্গনা : ২৬ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নারী সম্মানের চেয়ে নারী স্বাধীনতা জরুরি ?

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৩ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মালদায় ঐতিহাসিক যুব সম্মেলন

দক্ষিণবঙ্গের কল্যাণীর পর এবার উত্তরবঙ্গের মালদহ। স্বামী বিবেকানন্দের টানে আবারও যুব-জোয়ার। আয়োজনে এবার স্বামীজীর নামাঙ্কিত জন্মসার্ধশতবর্ষ আয়োজন সমিতির উত্তরবঙ্গ শাখা। অনুষ্ঠানে **তত্ত্বজ্ঞানানন্দ মহারাজ** স্পষ্টই বললেন, ‘‘স্বামীজীর আশীর্বাদ না থাকলে আর এস এসের পক্ষে এতবড় কাজ করা কখনোই সম্ভব হোত না।’’ তাঁর অতি মূল্যবান বক্তব্যের অনুলিখিত রূপটি আমরা তুলে ধরব পাঠকদের সামনে। এছাড়াও লিখছেন **ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ ও তরুণ পণ্ডিত**। রঙীন চিত্র সম্বলিত। অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ও থাকছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কপ্টার কেলেঙ্কারি

ইউপিএ সরকার এবং দুর্নীতি আজ সমার্থক শব্দে পরিণত হইয়াছে। কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি, টুজি কেলেঙ্কারি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ কেলেঙ্কারির পর ইউপিএ সরকারের নবতম কীর্তি হইল কপ্টার কেলেঙ্কারি। যাহারা এই সরকারের নেতা এবং পরিচালক সেই সোনিয়া গান্ধী ও মনমোহন সিং-এর শেষ আশ্বাসে দেশের মানুষ ভাবিয়া ছিলেন এইবার এই সরকার নিশ্চয়ই সতর্ক হইয়া চলিবে আর দুর্নীতিতে নিজেদের জড়াইবে না। তাহারা নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন অসতেরা চিরকালই অসৎ হইয়া থাকেন। ইহা জিনগত সমস্যা। এই সরকারের জিনও অসততায় ভরা। শত আন্না হাজারে আন্দোলন করিয়াও এই সরকারের কাছ হইতে দুর্নীতিকে দূরে রাখিতে পারিবেন না। এই সরকার যতদিন থাকিবে নিত্য নতুন দুর্নীতি ঘটিতে এবং প্রকাশ হইতে থাকিবে। আর চোরের মায়ের বড় গলার মতো সরকারের স্তাবকেরা দুর্নীতিতে যুক্ত থাকিবার পরই বলিবেন ইহা এন ডি এ আমলের ঘটনা। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ইউপিএ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী জেলে রহিয়াছেন। তবুও এনডিএ আমলের ঘটনা বলিয়া দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরাইতে চেষ্টা চলিতেছে। কপ্টার কেলেঙ্কারি কাণ্ডে একই কাণ্ড চলিতেছে। বিজেপি দলের মুখপাত্র প্রকাশ জাভড়েকর এজন্যই বলিয়াছেন, চুক্তি হইল ইউপিএ আমলে, কী ধরনের হেলিকপ্টার ক্রয় হইবে তাহাও ঠিক হইল ইউপিএ জমানায়, কপ্টার আসিল তাহাদের সময়ে, তাহার পর কীভাবে এনডিএ আমলের কথা আলোচনায় আসিতেছে? ইহাই কৌশল কারণ চোরেরা নিজেকে বাঁচাইতে সর্বসময় অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে চায় এবং ইহাই চৌর্যব্যাকরণের রীতি। বর্তমান কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিজের সততার ঢোল বাজাইতে একটি তথ্যপঞ্জী প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তথ্যপঞ্জীতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে ২০০৫-এর মার্চ হইতে ২০০৬-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে হেলিকপ্টার ক্রয় করিবার যাবতীয় ক্ষমতা ছিল সেসময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেই সময়কার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আবার বলিয়াছেন, ওই ডিল চূড়ান্ত করায় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার নাকি কোনও ভূমিকা ছিল না। যাহা করিবার তাহা করিয়াছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রক। উল্লেখ্য কপ্টার ক্রয় লইয়া চুক্তি হইয়াছিল কমপক্ষে চার হাজার কোটি টাকার। ইতালীয় আইনজীবীর মতে প্রায় ২১৭ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হইয়াছিল। ইতালিতে যে চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হইয়াছে,তাহাতে দুই জায়গায় বলা হইয়াছে কোনও একটি পরিবারকে ২৮ মিলিয়ন ইউরো বা ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই পরিবার কি ভারতের গান্ধী পরিবার? ইঙ্গিত বলিতেছে, চুক্তির ক্ষেত্রে ইতালীয় মিডলম্যান হ্যাশকের সঙ্গে প্রাক্তন বায়ুসেনাপ্রধান এস পি ত্যাগীর সম্পর্ক রহিয়াছে এবং এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতা কণিষ্ক সিংহের ঘনিষ্ঠতাও সন্দেহজনক। কণিষ্ক সিংহ হইল রাহুল গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই জন্যই বিজেপি নেতা কিরীট সোমাইয়া সিবিআইয়ের কাছে দাবি করিয়াছেন রাহুল গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা কণিষ্ক সিংহের ভূমিকা তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। সিবিআই ইতালি যাইতেছে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না কংগ্রেসকে বাঁচাইতে তাহাও সন্দেহের বিষয়। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারের বরাতের ব্যাপারে দালালির অভিযোগ যাহার বিরুদ্ধে সেই ক্রিস্টেন মিচেল যে কংগ্রেস ও তাহার দলের মন্ত্রীদের পরিচিত ছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন আমাদের গোপন করিবার কিছুই নাই। কিন্তু ঝুলি হইতে গোপন তথ্য যাহাতে কিছুতেই বাহির হইতে না পারে সে ব্যাপারে কংগ্রেস প্রস্তুতি লইতেছে। কংগ্রেস এখন বলিতেছে— আমরা সবাই সাধু আমাদেরই চৌর রাজত্বে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত অসৎ সরকারকে মানুষ আর কতদিন সহ্য করিবেন তাহা দেখিবার বিষয়।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যেমন সঙ্গীতে একটা করে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই একটা একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলো তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্কার বলুন, আর যাই বলুন, সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদয়টা ভেঙ্গে গেলে চিন্তার প্রবাহ আসে। ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে নিশ্চয় ভাঙ্গবে, তখন ধর্মতরঙ্গ খেলতে থাকবে। ভারত ভারতই। আমরা জাপানীদের মতো নই, আমরা হিন্দু। ভারতের হাওয়াটাতেই কেমন শান্তি এনে দেয়। আমি এখানে সর্বদা কাজ কচ্চি, কিন্তু এরই মধ্যে আমি বিশ্রাম লাভ কচ্চি। ভারতে ধর্মকার্য কল্লে শান্তি পাওয়া যায়, এখানে সাংসারিক কার্য কত্তে গেলে শেষে মৃত্যু হয়—বহুমূত্র হয়ে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

প্রবল দুর্যোগ উপেক্ষা করে মালদায় ঐতিহাসিক যুব-সমাবেশ

মঞ্চে বক্তব্যরত মোহনরাও ভাগবত। রয়েছেন সঙ্ঘের অন্যান্য অধিকারীদের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্বামী বিবেকানন্দের টানে প্রায় ৮০০০-এর উপস্থিতি দেখে দৃশ্যতই উৎফুল্ল বেলুড় শিল্পমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ বলেন, ‘‘আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এত বিপুল সংখ্যক যুবক এসেছেন দেখে। তাঁরা শান্তভাবে বসে আছেন। যেখানে বসতেও অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। এটা আসলে স্বামীজীর প্রতি যুবকদের শ্রদ্ধা-ভক্তিরই পরিচয়।’’ স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষ আয়োজন সমিতি উত্তরবঙ্গের আহ্বানে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মালদার বৃন্দাবনী ময়দানে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে তত্ত্বজ্ঞানানন্দ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, মালদা-র প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিউপূজন সিং প্রমুখ। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তাজপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী জীবানন্দ, মহাউদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী, সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার, ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, সহকার্যবাহ গোপালদাস মহাপাত্র, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, অখিল ভারতীয় সহসেবা প্রমুখ অজিত মহাপাত্র।

প্রবল দুর্যোগের মধ্যেই বেলা একটা নাগাদ মালদা শহরে বিবেকানন্দ স্কুলের পাশের মাঠ ও হিন্দি স্কুলের সামনের মাঠ থেকে যুবকদের দু'টি শোভাযাত্রা বের হয়। প্রথম শোভাযাত্রাটি মিশন রোড, মকদুমপুর, বিমল স্ট্যাচু রোড, কেজি সান্যাল রোড, রাজমহল রোড ও ফোয়ারা মোড় হয়ে বৃন্দাবনী মাঠে উপস্থিত হয়। অপর

শোভাযাত্রাটি নেতাজী মোড়, ফুলবাড়ি, বি এস রোড ও ফোয়ারা মোর হয়ে বৃন্দাবনী মাঠে পৌঁছে যায়। ইংলিশবাজার বিধানসভা উপনির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরজায় মালদাবাসী তিতিবিরক্ত। এহেন পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তোয়াক্কা না করে এই বিশাল সংখ্যক যুবকের সুশৃঙ্খল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক শোভাযাত্রা নগরবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে বৃন্দাবনী মাঠের সভায় মোহনরাও ভাগবত বলেন, ''এর ফলে গোটা বিশ্ব তো লাভবান হলো-ই, কিন্তু ভারত পেল সঞ্জীবনী সুধা।'' বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের মূল স্লোগান 'ভারত জাগো বিশ্ব জাগাও'-এর তাৎপর্য উপস্থিত যুবকদের স্মরণও করিয়ে দেন তিনি, ''বিশ্বকে দেবার জন্য আমাদের অনেক কিছু রয়েছে। বিশ্বকে দিতে তাই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আর এটা হলেই ভারত নিজে জাগ্রত হয়ে বিশ্বকে জাগাতে পারবে।'' শ্রী ভাগবত আরও বলেন, ''আমরা আমাদের পরম্পরার বৈভব ভুলে গিয়েছি। হাজার বছরের পরাধীনতার মানসিকতা আমাদের গ্রাস করেছে। হিন্দু সমাজ আজ ঘরে-বাইরে বিব্রত। এখন আমরা কি কাঁদব, হেরে যাব, নাকি পালিয়ে যাব? স্বামীজী কাপুরুষতাকে ঘৃণা করতেন। আমাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরকেই করতে হবে। তা অন্য কেউ করে দেবে না। দেশের সেবার জন্য আমাদের সর্বস্ব পণ করতে হবে। আজ থেকেই এ সংকল্প করুন। শুধু কার্যক্রমের জন্যই সংকল্প নয়। নিজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সংকল্প করুন। তবেই ভারতমাতা আগের থেকে তেজস্বিনী ও ওজস্বিনী হয়ে বিশ্বজননীর আসনে অধিষ্ঠিতা হবেন।''

স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ তাঁর ভাষণে স্পষ্ট উল্লেখ করেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ না থাকলে আর এস এস এত বড় কাজ করতে পারত না।' তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, 'স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর শিষ্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক গুরুজী গোলওয়ালকরের ওপর হিন্দু রক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন।' তত্ত্বজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে ভারত তার চরিত্র, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভালবাসা দিয়েই বিশ্বজয় করবে, তরবারি দিয়ে নয়। রাজা-বাদশাদের এদেশে কেউ তেমন পুজো করেন না। এদেশে পূজিত হন শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, গুরুনানক, বেদ, উপনিষদ, গীতা। ভারতবাসীর ধর্মের প্রতি টানটা এর থেকেই বোঝা যায়।'

তুষারকান্তি ঘোষ এই সমাবেশকে 'মালদার ইতিহাসে পবিত্রক্ষণ' বলে উল্লেখ করেন। আজ থেকে ৫০ বছর আগে স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর বাণী ও রচনাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ ও আবেগের কথা স্মরণ করে দৃশ্যতই আবেগমথিত হয়ে পড়েন তুষারবাবু। তিনি বলেন, ''ক্ষমতার মদমোত্ততায় আজ যাঁরা হিন্দুধর্মকে অপমান করতে উদ্যত, তাঁরা একদিন ধ্বংস হবেনই। কারণ হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা সৈনিকরা নয়, বহন করছেন সন্ন্যাসীরা।'' শিউপূজন সিং তাঁর ভাষণে ২০১৩-১৪ বর্ষব্যাপী বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করেন। কেন্দ্রের মূল আহ্বান 'ভারত জাগো বিশ্ব জাগাও' এই সুবিশাল কার্যক্রমগুলির মধ্যে দিয়ে যথার্থরূপ পরিগ্রহ করবে বলে সংগঠনের তরফে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

জেলে বসেই জেহাদের ছক কষেছিল আফজল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে সেকুলারবাদীদের চোখের জলের বাঁধ যেন কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। সূত্রের খবর যে, ডিসেম্বর ২০০২-এ সংসদ হামলায় যে ভয়ানক ছক কষে ছিল, বহু টালবাহানার পর গত ৯ ফেব্রুয়ারি সেই আফজলের

প্রাণদণ্ড হলো। আফজল জেলে বসে জেলের আধিকারিকদের কাছে দেশের অখণ্ডতা, দুর্নীতি এইসব নিয়ে কথাবার্তা বললেও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন সন্ত্রাসীদের কাছে সে আদতে এক সন্ত্রাসবাদীই। এমনই তথ্য উঠে এসেছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের এক সদস্য ফারুক ওরফে আফতাব আলমের জবানবন্দী থেকে। গত ১৩ জুলাই মুম্বাই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত আফতাব জেরায় বলেছে যে, আফজল গুরু ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের কাজকর্ম সমর্থন করত। সে আফতাবকে জেলে বসে বলেছে, সে অনুতপ্ত এইজন্য যে, কাশ্মীরে আজাদি আনতে সেখানে যথেষ্ট সাহসী যুবক নেই। তার বিশ্বাস কাশ্মীর যদি ফিদাঁয়ের অর্থাৎ প্রাণ দেওয়ার জন্য ২০০ জন এমন যুবক তৈরি করতে পারত তবে তাদের জেহাদের সামনে ভারত নতজানু হয়ে কাশ্মীরকে আজাদি দিতে বাধ্য হোত।

উপত্যকায় যারা আফলজকে জানত একজন নিরীহ, গোবেচারা ধরনের এক যুবক, যে সদা-সর্বদা মির্জা গালিবের কবিতা আওড়ায়, গজল ভালবাসে, তাদের কাছে আফতাব আলমের বিবৃতি খুব বিস্ময়কর। কিন্তু ফারুক বারবার জেরায় বলেছে যে আফজল বরাবরই জেহাদের সপক্ষে। আফজলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না হলেও ফারুকের দাবি, আফজলের সঙ্গে জেলে তার বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

সরকারি যাত্রা উৎসব বারাসাত ঘুরে বাগবাজারে

বিকাশ ভট্টাচার্য।। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কারণ রাজ্যসরকার পরিচালিত যাত্রা উৎসব এবার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চ ছেড়ে বারাসাতের কাছারি ময়দানে কেন? গত বেশ কয়েকবছর যাবৎ অর্থাৎ সরকারি যাত্রামঞ্চ তৈরি হওয়ার পর থেকে তো যাত্রা উৎসব বাগবাজারের ফণীভূষণ নামাঙ্কিত যাত্রামঞ্চেই হয়ে আসাছে। তারপর দেখলাম, শুধু উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে বারাসতে, বাকী ২৪ দিন বাগবাজারে যাত্রামঞ্চেই যাত্রাপালার আসর বসবে। কারণ যাত্রা উৎসবের উদ্বোধক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনারণ্য ছাড়া কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। অন্ততঃ ৫০ হাজার দর্শক তো চাই। তাই উৎসবের সহযোগী যারা অর্থাৎ যাত্রা প্রহরী, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন ও কলকাতা যাত্রাকর্মী ইউনিয়নের ভরসায় না থেকে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা উঠে পড়ে লেগেছেন লোক জড়ো করার কাজে। না হলে আবার দিদির 'চাবকানি'। ভাবতে ভালো লাগছে বারাসাতের মতো জায়গায় ৫০ হাজার 'যাত্রামোদী' ভীড় করেছেন যাত্রা উৎসবে। খবরে প্রকাশ, উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসক সঞ্জয় বনশল থেকে শুরু করে পুলিশ সুপার সুগত সেন এবং জেলা পুলিশ লাইন তো বটেই, ব্যারাকপুর ব্যাটেলিয়ান থেকেও অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী এই যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান থুড়ি মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। না, কোনও যাত্রাদল বা যাত্রাকর্মীদের ধারে কাছে দেখা যায়নি। অবশ্য উৎসবের দুদিন আগে মধ্যমগ্রাম তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে জেলার সমস্ত বিধায়ক ও ব্লক নেতাদের জরুরি বৈঠক হয়ে গেছে ৫০ হাজার 'যাত্রামোদী' জোগাড় করার কাজে উদ্যোগী হওয়ার ব্যাপারে। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব খুঁটিয়ে দেখেছেন। উদ্বোধনী যাত্রাপালাও বাছা হয়েছে অনেক ভেবেচিন্তে। নট্ট কোম্পানীর 'পরিবর্তনের পর' যে পালায় বারবার মা-মাটি-মানুষের কথা উঠে এসেছে। হাওয়াই চটির প্রসঙ্গ এসেছে। যে হাওয়াই চটি হাজরার ফুটপাথ থেকে একজনকে র‍্যাজের মুখ্যমন্ত্রী করেছে। যে পালায় কোনও চরিত্রের মুখে বারবার উচ্চারিত হয়েছে একটি নাম— মমতা। ঐতিহ্যমণ্ডিত নট্টকোম্পানীর অবস্থা দেখে করুণা হয়। অবশ্য এর পুরস্কারও হাতে গরমে পেয়ে গেছেন নট্টকোম্পানীর মাখনলাল নট্ট। তাঁকে এই উৎসবে 'শান্তিগোপাল' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 'তপন কুমার' পুরস্কার পেয়েছেন বেলা সরকার। এই দু'জন ছাড়া মঞ্চ ভরিয়ে ছিলেন সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী। সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কাকলি ঘোষদস্তিদার, বিধায়ক দীপক চক্রবর্তী ও রথীন ঘোষ। ভালো লাগত যদি এদের সঙ্গে বর্তমান যাত্রা জগতের অন্তত কয়েকজন প্রবীণ যাত্রাশিল্পী থাকতেন।

উৎসবের উদ্বোধনে যাত্রার বর্তমান দুরবস্থা, যাত্রার উন্নতিতে সরকার কী করতে পারেন, এসব নিয়ে আলোচনা না হলেও উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া এসব কথা বলতে ভোলেননি। এই কাছারি ময়দানেই ১৯৯৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি যুবকংগ্রেসের সভায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান যুব কংগ্রেসকর্মী গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। তখন বামফ্রন্টের রাজত্ব। আর যুবকংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই সভার মুখ্য বক্তা।

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 'চমক' ছাড়া থাকতে পারেন না। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই 'যাত্রামোদী'দের জানিয়ে দেন, শুধু উদ্বোধনী যাত্রা নয়। আরও তিনি দিন চলার কথা কাছারি ময়দানে যাত্রার আসর। পূর্ব পরিকল্পনা যাই থাকুক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বারাসাতের মানুষ যদি একটু যাত্রাপালা দেখতে পায়, ক্ষতি কি? বিশেষ করে বারাসাতে যখন পুরানো নেতা প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন জেলা সভাপতি গোপাল মুখোপাধ্যায়কে দলে ফিরিয়ে এনে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ঘর গোছাতে উদ্যোগী হয়েছেন নেত্রী!

গুজরাটে পুরসভা নির্বাচনেও বিজেপি-র জয়জয়কার

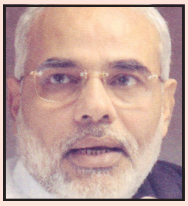

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গুজরাটে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি। সম্প্রতি পুরসভার ভোটেও সেই ধারা অব্যাহত— বিজেপির জয়জয়কার। মোট ৭৬টি পুরসভার মধ্যে বিজেপি জিতেছে ৪৭টিতে। কংগ্রেসের জয় হয়েছে ৯টিতে। মোট ১৯০৫টি আসনের মধ্যে ১১৪২টি আসনে বিজেপি জিতেছে। মুসলিম অধ্যুষিত সালাইয়া পুরসভায় বিজেপি-র ২৪ জন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান
স্বস্তিকা
প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

খারাপের থেকে আরও খারাপের দিকে যাওয়াটাও পরিবর্তন

গূঢ়পুরুষের ■ কলম

বিধানসভার তিনটি কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটের ফলাফলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে মমতাময়ী সরকারের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। সিপিএমের গুণ্ডারাজ পরিবর্তন করে বাংলায় শান্তি শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। সোনার বাংলা গড়ে দেওয়ার গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল। মানুষ বিশ্বাস করেছিল দলনেত্রীর প্রতিশ্রুতির সততায়। তিনি পেয়েছিলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। রাজ্যে ক্ষমতা দখলের প্রথম তিন-চার মাস মমতার মুখ ও মুখোশ-এর মধ্যে পার্থক্যটা ধরা যায়নি। তাঁর মা-মাটি-মানুষের স্লোগান থেকে 'মানুষ' কথাটা বাদ পড়ে সেখানে 'আমি' যুক্ত হবে কেউ তা ভাবেননি। যেমন, নেত্রী এখন প্রতিটি জনসভায় বলেন, 'আমি যেখানে যাব সেখানে সোনা ফলবে। আমি লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি করে দিয়েছি। আমি রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার এনে দিয়েছি। কেন্দ্রের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাইনি। তবু ব্লকে ব্লকে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল গড়ে দিয়েছি। কাজ করতে জানলে উন্নয়নের জন্য টাকা লাগে না। আমি কাজ করতে জানি। তাই যখনই জেলা-সফরে যাই তখনই গুচ্ছ গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করে দিয়ে আসি।' বাংলার মানুষ এই 'মা-মাটি ও আমি' স্লোগানটি মোটেই পছন্দ করছেন না। তাই অনুমান করা কঠিন নয় যে তিনটি উপনির্বাচনেই তৃণমূল প্রার্থীরা পরাজিত হচ্ছেন। বাংলার মানুষ নেতা নেত্রীদের দেমাক বা হামবড়াই পছন্দ করেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও বলেন না আমাদের দলের সরকার উন্নয়নের কাজ করছে। বলেন, 'আমি করছি।' এই দাম্ভিকতাই তাঁর পালের হাওয়া কেড়ে নিচ্ছে। অহংবোধ বা দম্ভ কেউ সহ্য করে না। সাম্প্রতিক গার্ডেনরিচ কাণ্ডে নিহত পুলিশ কর্মী তাপস চৌধুরীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি ফাইল দেখিয়ে বলেন, 'আমি তাপসবাবুর মেয়ের চাকরি করে দিলাম। আমি বলে দিয়েছি তাপসবাবুর যত বছর চাকরির মেয়াদ ছিল তত বছর তাঁর মাস মাইনের টাকাটা স্ত্রী পাবেন। আমি বলে দিয়েছি ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে।' বাস্তবে, কর্তব্যরত অবস্থায় খুন হয়ে গেলে এর সবটাই কলকাতা পুলিশের আইনে দেওয়া হয়ে থাকে। মমতা 'আমি আমি' করে যতই আত্মপ্রচার করুন না কেন রাজ্যবাসী জানেন, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা ছাড়া তিনি আর কিছুই করেননি। এইটুকুও তিনি করতেন না যদি ববি হাকিমদের দৌরাত্ম্যে তাঁর নিজের মুখ পুড়তো না। ঘটা করে তাপসবাবুর পরিবারকে 'আমি কত টাকা দিয়েছি' বলতে হয়েছে কারণ এই কথা বলা ছাড়া 'ড্যামেজ কন্ট্রোলের' দ্বিতীয় পথ ছিল না। ববি হাকিমকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিলে মমতার সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁকে প্রকাশ্যে তিরস্কারের সাহসও নেই দলনেত্রীর। পার্টি চালাতে প্রচুর টাকা লাগে। এই টাকার যোগান যারা দেয় তাদের পার্টি চোখের মণির মতোই রক্ষা করে। ঠিক এই কারণেই সুভাষ চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ শেঠ বা সুশান্ত ঘোষের মতো কমরেডরা সিপিএমের চোখের মণি ছিলেন। তাঁদের সাত খুন মাফ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের নামে যা হয়েছে তা আদতে লাল গুণ্ডারাজ পাল্টে আমরা সবুজ গুণ্ডারাজ এনেছি। লাল আবিরের বদলে বাজারে এখন সবুজ আবিরের বিক্রি বেড়েছে। এই পরিবর্তনটাই সাদা চোখে বাজারে গেলে দেখা যায়। যেমন, আগে কালী পুজোর রাতে মদ মাংস জুয়া খেলাটা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এবার সরস্বতী পুজোর রাতে পাড়ায় পাড়ায় যেভাবে মদের ফোয়ারা চলেছে তাকে যদি 'পরিবর্তন' বলেন তবে মানতে বাধা নেই। হুগলি জেলার চন্দনগরে একটি মেয়েদের স্কুলে একদল ছাত্রী টিফিন টাইমে জলের বোতলে মদ ভরে নিয়ে এসে তা পান করে বেহুঁশ হয়ে যায়। কোনও অজ্ঞাত কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের শাস্তি দিতে সাহস পায়নি। এই সাহস হারানো বা ভয় হচ্ছে পরিবর্তন। সাধারণভাবে পরিবর্তন কথাটার অর্থ শুভ পরিবর্তন। কিন্তু কেউ যদি বলেন, খারাপ পরিস্থিতি থেকে আরও খারাপ অবস্থার দিকে যাওয়াটাও পরিবর্তন তবে কী ভুল হবে। কোনও সন্দেহ নেই যে মমতার ভৈরব বাহিনী পশ্চিমবঙ্গকে পিছনের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আসন্ন উপনির্বাচনের ফলাফলে তিনটি উপনির্বাচনেই ক্ষমতাসীন তৃণমূল হারলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের ভৈরবরা 'ডায়রেক্ট অ্যাকসনে' নামবে তা আগাম বলে দেওয়া যায়। এই কায়দায় ১৯৭২ সালে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করেছিল। পরে সিপিএম ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসের ভৈরব বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে দলের ক্যাডার বাহিনী করে। সিপিএম ক্ষমতা হারালে ক্যাডর বাহিনী রাতারাতি সবুজ ভৈরব হয়ে দিদির দলে ঢুকে পড়ে। দিদিও বুঝে যান সরকার চালাতে দাঙ্গাবাজ সবুজ ভৈরবদের দরকার। ওদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাই সুভদ্র, শিক্ষিত, ভদ্রলোকদের দল থেকে সরিয়ে দিয়ে হাকিম, ইকবালদের নেতৃত্বের প্রথম সারিতে এনেছেন দিদি। তৃণমূল দল গঠনের সময় থেকে যাঁরা মমতার পাশে থেকে লড়াই করেছেন তাঁদের একজনও আজ নেই। তাঁরা রাজনৈতিক লড়াই করতে শিখেছিলেন। লড়াই করেছেনও। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাইয়ের লড়াই শেষ। তাই আর তাঁদের প্রয়োজন নেই। এখন দল চালাতে তোলাবাজদের দরকার। কংগ্রেস ১৯৭২ সালে যে পথ দেখিয়েছিল, ১৯৭৭ সালের পর থেকে সিপিএম সেই পথকে আরও মসৃণ করেছিল। মমতার তৃণমূল ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে সেই বহু ব্যবহৃত পথকে রাজপথ করেছেন। বাঙালি পরিবর্তনের ছলনায় ভুলে বাংলাকে নরকের রাজপথে ঠেলে দিয়েছে। মমতাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

প্রসঙ্গ নরেন্দ্র মোদী : নীতিশ কুমার ভাবুন এবার

তারক সাহা

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী আমাদের দেশের রাজনীতি হলো ভোট সর্বস্ব। এতে যদি দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন হয় তো হোক। ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের বদলে বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয় তো দিক। তাতে কুছ পরোয়া নেই রাজনীতির কারবারীদের। তা সে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ইমাম ভাতা চালু করুন বা কেন্দ্র দীর্ঘ আট বছর টালবাহানার পর দেশের জঘন্যতম

সন্ত্রাসবাদী আফজলগুরু প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করুক। রাজনৈতিক নেতারা দেশের স্বার্থের আগে নিজেদের স্বার্থ আগে দেখেছেন। হিন্দু সমাজ বহুধা বিভক্ত। তাদের নিজস্ব কোনও এমন নেতা নেই যার বা যাদের কথায় হিন্দুরা এককাট্টা হয়ে কোনও নির্দিষ্ট দলকে ভোট দেয়। তাই মুসলিম ভোট পেতে গেলে মসজিদের ইমামদের সন্তুষ্ট করা চাই, কারণ মুসলিমরা কাকে ভোট দেবে তার নির্দেশ আসে মসজিদ থেকে।

বিহারের নীতিশ কুমার মুসলমান তোষণে কম কিছু যান না। মমতার মতো প্রকাশ্যে ন্যাক্কারজনক ইমামভাতা ঘোষণা করেননি বটে, তবে নরেন্দ্র মোদীর অদম্য গতিরোধ করতে কম কিছু তৎপর হননি। সারাদেশে গুজরাট দাঙ্গায় মোদীর হাত রয়েছে বলে মুসলিম প্রীতি উদ্গীরণ করতে গত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মোদীর বিহারে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এরকম করা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও এন ডি এ জোট অটুট রাখতে জোটের বৃহত্তম শরিক বিজেপি তা মেনে নেয়।

কিন্তু ২০১২ সালে তৃতীয়বার এক নাগাড়ে গুজরাট জয়ের পর নরেন্দ্র মোদী প্রায় অপ্রতিরোধ্য। দেশজুড়ে কংগ্রেসী অপশাসন, সীমাহীন দুর্নীতি, নীতিরূপায়ণে প্রায় পঙ্গু এক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি প্রায় ডুবতে বসেছে। উন্নয়নের হার এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম, দ্রব্যমূল্য আকাশ ছুঁতে আর বেশি বাকি নেই, বাণিজ্য ঘাটতি অপরিমেয়। দেশের উন্নয়ণের গড় ৫ শতাংশ আর কেবল গুজরাটে তা ১১ শতাংশের মতো। দেশে যদি গুজরাটের

মতো রাজ্য না থাকত তবে দেশের উন্নয়নের হার আর কত নীচে নামত কে জানে!

এই মুহূর্তে দেশে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হলেন মোদী। গুজরাট বিধানসভায় ব্যাপক সাফল্যের পর মোদীর সাফল্যের মুকুটে নবতম সংযোজন হলো গত ১০ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া পৌরসভা নির্বাচনে অপ্রতিরোধ্য গতি বজায় রাখা। সংখ্যালঘু ছুৎমার্গের আর কোনও চিহ্নই নেই মোদীর গায়ে। গুজরাট বিধানসভায় তা প্রমাণিত হয়ে গেছে, আরেকবার প্রমাণিত হলো এই পৌরসভা নির্বাচনে। সদ্য সমাপ্ত পৌরসভার নির্বাচনে নয়টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পৌরসভায় বিজেপি-র জয়লাভ। ২০০৮ সালে সালায়া, জামনগরের মতো নগর যেখানে ৯৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সেখানে একটি আসন না পেলেও এবারে কিন্তু ২৭টি আসনের সবগুলিতেই জয়ী মোদীর দল। গত বিধানসভা নির্বাচনে ১৮০টি বিধানসভা কেন্দ্রের কোনও কেন্দ্রেই সংখ্যালঘুদের একজনকেও টিকিট না দিয়ে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে বিজেপি। এবারে মোদীর দল কৌশল বদলেছে। সালায়ায় ২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪ জন প্রার্থী হলেন প্রথমবারের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ৭৬টি পৌরসভার মধ্যে ৪৭টি পৌরসভার দখলে বিজেপি। সবচেয়ে চমকপ্রদ ফল সালায়ায়। সংখ্যালঘুদের কাছে ২০০২ সাল হলো এক মলিন ইতিহাস। মোদীর আর্থিক উন্নয়ন হারিয়ে দিয়েছে সমস্ত বিরোধীদের সাম্প্রদায়িক উস্কানিকে। মুখে কালি লেপে দিয়েছে তাদের যারা দশ বছর ধরে মোদীকে অপছন্দ করে এসেছে। মোদীর উন্নয়নের কাছে পরাস্ত মমতার ইমামভাতা। মোদী গুজরাটে কোনও টাকা বা চাকরি বিলি করেননি সংখ্যালঘুদের। কেবল উন্নয়ন বিলি করেছেন মোদী। ইমামভাতা দিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষের হৃদয় জয় করা যায়, সমগ্র সংখ্যালঘু যুবকদের হৃদয় জয় করা যায় না। আর ঠিক এটাই করে এসেছেন মোদী। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় অনগ্রসর জাতি যে রাজ্যে বাস করে সেই রাজ্যে নকশালদের উৎপাত নেই কেন? এসব বেয়াড়া প্রশ্নের জবাব নীতিশ কুমারদের জানা আছে কিনা জানা নেই। তবে যেটা জানা গিয়েছে সেটা হলো এই পৌরসভাগুলির ১৯১৯টি আসনের মধ্যে ১১৫১টিতেই জয়ী বিজেপি। কংগ্রেসের ঝুলিতে মাত্র ৪৪৭। ২০০৮-এ বিজেপি এগুলিতে জয়ী হলেও এবারের নরেন্দ্র মোদীর অবস্থান আরও ভাল। সোনিয়ার দলের হাল বিধানসভা নির্বাচনের পর আরও সঙ্গীন। গতবারের তুলনায় এবারের ফল ঠিক অর্ধেক। মাত্র ৯টি পৌরসভা সোনিয়া-মনমোহনের দলের ঝুলিতে।

তাহলে কি এটা প্রমাণ করে না যে, মোদী আর তথাকথিত কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা নন পর পর দুটো নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর? ইউপিএ সরকার এখন কালমাডি, এরাজা, মুলায়ম, মায়াবতী, লালুর মতো দুর্নীতিগ্রস্তদের আস্তানা। ২০১৪ সাল ইউপিএ-র বিরুদ্ধে (atmost Perfidious Activities) একজোট হয়ে এন ডি এ-র লড়ার শপথ নেবার বছর, এক দুর্নীতিবাজ, অপদার্থ, জনবিরোধী সরকারকে বিতাড়ন করার বছর। আর সেই সরকারের মূর্ত প্রতীক হলেন নরেন্দ্র মোদী। তাই একটু ভাবুন নীতিশ কুমার, দেশের স্বার্থে, শুধুমাত্র ভারতবাসীদের জন্য, প্রগতির জন্য।

দিল্লীর শ্রীরাম কলেজে নরেন্দ্র মোদীর অবিস্মরণীয় বক্তৃতার তাৎপর্য

তথাগত রায়

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। দীর্ঘকায় সুপুরুষ চেহারা, সাদা চুল, ছোট করে ছাঁটা সাদা দাড়ি, চশমার পিছনে দুটি অসাধারণ উজ্জ্বল চোখ। মোটা অধরোষ্ঠে স্মিতহাসি। খানিকক্ষণ সঙ্গে দাঁড়ালে মনে হয় মানুষটার শরীর দিয়ে যেন শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। গত একদশকের উপর সারা ভারতে, সঙ্গত ও অসঙ্গত কারণে, সবচেয়ে বেশি আলোচিত নামের মধ্যে একটি। কিন্তু এঁকে আমরা দেশের একটি রাজ্যের তিনবার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই চিনি। দিল্লীর বিখ্যাত শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্স-এ বার্ষিক শ্রীরাম স্মারক বক্তৃতা কে দেবেন তা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে বৃহদংশই নরেন্দ্র মোদীর সপক্ষে মত জানিয়েছিলেন। যার ফলে গত ৬ ফেব্রুয়ারী যে বক্তৃতাটি নরেন্দ্রভাইয়ের এই কলেজে আমরা শুনলাম তা এক কথায় অবিস্মরণীয় এবং এই বক্তৃতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতেই এই প্রবন্ধ।

এই বক্তৃতার ভিতরে ঢোকার আগে বলা প্রয়োজন, কোনও সর্বভারতীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এটি নরেন্দ্রভাইয়ের সম্ভবত প্রথম বক্তৃতা। সেদিক দিয়ে এটি তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই। কিন্তু বক্তৃতায় নরেন্দ্রভাই কিছু কিছু কথা, যা পরিষ্কার করে বলা অনেকদিন আগেই উচিত ছিল, তা এত পরিষ্কার করে বলেছেন যে সেদিক দিয়েও বক্তৃতাটি অসাধারণ।

প্রথমত নরেন্দ্রভাই এই বক্তৃতায় ভারতের রাজনীতিতে 'ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্স্' খতম করে 'ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্স্'-এর যে ডাক দিয়েছেন তাকে একটি মাইলফলক বলা যায়। স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে আমরা এই ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির খেলা দেখে এসেছি, যার মূল কথা হচ্ছে, জনসাধারণকে বিভিন্ন ভাষাগত, ধর্মগত, জাতিগত শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাদের একটি শ্রেণীকে মাথায় তুলে তাদের ভোট কুক্ষিগত করে রাখা। এই শ্রেণীটিরই নাম ভোটব্যাঙ্ক এবং আজ পর্যন্ত বিজেপি ছাড়া প্রতিটি দল এই রাজনীতি করে গেছে। এবং যেহেতু নিজের 'চোর' বদনাম ছাড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে 'চোরের মায়ের বড় গলা' নীতিতে অন্যকে দোষারোপ করা, তাই এইসব দলগুলি ক্রমাগত বিজেপি-কে 'সাম্প্রদায়িক' বলে গালাগালি দিয়ে গেছে। অতীব দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, অর্থাৎ সংবাদমাধ্যম, এই ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিকে বাহবাই দিয়ে এসেছে, নিন্দা করেনি। তার ফলে ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতি কালক্রমে বাহাদুরি বলেই পরিগণিত হয়েছে, নীচতা হিসেবে নয়, যা হওয়া উচিত ছিল।

ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির আবিষ্কর্তা অবশ্যই কংগ্রেস। কংগ্রেস পঞ্চাশের দশকেই আবিষ্কার করেছিল যে এই দেশের মুসলিমরা শিক্ষাগতভাবে ও সংস্কৃতিগতভাবে পশ্চাদ্পদ এবং তার ফলে তারা অনেকেই, প্রায় অনুভবে, স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা অন্য ধর্মগুরুর কথায় ভোট দেয়। কেন মুসলিমরা পশ্চাদ্পদ তার আলোচনার পরিসর এখানে নেই, শুধু এটুকু বললেই হবে যে হিন্দুরা যেভাবে দুহাত বাড়িয়ে ইংরাজের শিক্ষাগ্রহণ করেছিল, মুসলিমরা তা অতটা করেনি। এবং দ্বিতীয়ত, যারা করেছিল তাদের বৃহদংশ দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যায়, পড়ে থাকে কেবল নিরক্ষর বা অর্ধসাক্ষর চাষীমজুরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে যা করা উচিত ছিল তা হলো এই মুসলিম চাষীমজুরদের সত্বর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা দেখলেন, তা করে কী লাভ? শিক্ষিত হলে তো মুসলিমরা হিন্দুদের মতো কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে ভোট দেবেন— রাজনীতিসচেতন মানুষ যা দিয়ে থাকেন। তার চেয়ে কি অনেক ভাল নয় এদেরকে অশিক্ষিত রাখা, বা শিক্ষার নামে আধুনিক শিক্ষার বদলে মক্তব-মাদ্রাসার ধর্মাশ্রিত শিক্ষা দেওয়া? তাহলে পুরো সমাজের কাছে ভোটের আবেদন রাখতে হবে না! গোটাকতক ইমাম- পীরকে 'ম্যানেজ' করলেই কাজ হয়ে যাবে!

এই কুৎসিত রাজনীতি অনুসরণ করেছেন

বিহারের লালুপ্রসাদ, করছেন বাংলার মমতা। লালু যাদব মুসলিমদের সঙ্গে স্বজাতি যাদবদের মিলিয়ে যে ভোট ব্যাঙ্ক বানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যম তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদী যদি ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির বিপক্ষে এবং উন্নয়নের রাজনীতির সপক্ষে উত্তর মেরু হন তাহলে লালুপ্রসাদ দক্ষিণ মেরু। লালু প্রকাশ্যেই বলতেন, উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শক্তি সঞ্চয় বা এমপাওয়ারমেন্ট। কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ এমন কথা ভাবতে পারে না, কিন্তু লালু ভেবেছেন এবং বিহারকে ভাসিয়ে, রসাতলে নামিয়ে ছেড়েছেন। বিহারের রাস্তা চষা ক্ষেতের মতো হয়ে গিয়েছিল— তার সপক্ষে লালু বলতেন, আমি তো ইচ্ছে করেই রাস্তা চষা ক্ষেতের মত রেখেছি, যাতে পাটনার বড়লোকরা জোরে গাড়ি ছোটাতে না পারে, ছোটালেই তোমাদের বাচ্চারা সেই গাড়ির তলায় পড়বে। মনে পড়ে ইস্তাহার লেখক, কবি-নামধারী সুকান্তর (অপ)কবিতা, ''বলতে পারো, বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে/আর গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?'' এটা ঠিক ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতি না হলেও, উন্নয়ন-বিরোধী রাজনীতি— গরীবকে মোটর চড়াবার জন্য উন্নয়ন প্রয়োজন, তা না করে তাদেরকে 'বড়মানুষ'-এর বিরুদ্ধে খ্যাপানো অনেক সহজ। অথচ, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই অপকবি-কে বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাসনে বসবার চেষ্টা করেছিল!

এই ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতি অনুসরণ করে কংগ্রেস এবং সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে এবং অসমে কোটি কোটি বাংলাদেশি মুসলমান ঢুকিয়েছে, বিজেপি প্রতিবাদ করলেও শোনেনি। তার মাশুল দেশবাসী আজ দিচ্ছে--- দেগঙ্গার লুটপাটের মধ্যে দিয়ে, উত্তরবঙ্গ জুড়ে জাল নোটের বন্যার মধ্যে দিয়ে। অসমে বোড়োদের উপর অত্যাচার ও তার প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। এই ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতির পরাকাষ্ঠা আজ পশ্চিমবঙ্গে দেখাচ্ছেন মমতা। মমতার মস্তিষ্কে উন্নয়নের জন্য চিন্তাভাবনা ঢোকেই না। সরকারে থেকে তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে, পরবর্তী নির্বাচনটা কি করে জেতা যায় তার মতলব ভাঁজা। এবং সেজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক তোয়াজের সহজতম রাস্তা, যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমাম ও মুয়েজ্জিন ভাতায়, মুসলিম সংরক্ষণে, মুসলিমপ্রধান অঞ্চল মগরাহাটে মৃত চোলাইখোরদের পরিবারদের ভাতা প্রদানে এবং চরম মৌলবাদী, ফুরফুরা শরীফের পীর মহম্মদ তোহা সিদ্দিকীকে তৈলমর্দনে, ফুরফুরা পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এক রেললাইন পাতার প্রস্তাবে।

এই ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতি কাঁসিরাম ও মায়াবতী করেছেন দলিতদের নিয়ে; মুলায়ম করেছেন মুসলিম ও ওবিসি-দের নিয়ে। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ এক নড়বড়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সিন্দুক থেকে রিপোর্ট বার করে ধুলো ঝেড়ে ভারতবাসীকে আরও বিভাজন করেছেন। যদি মহামান্য আদালত না থাকতেন তা হলে এই বিভাজনের ফলে দেশ এতদিনে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

এই নোংরা, ক্লেদাক্ত, বিভাজনমুখী রাজনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, ভোটব্যাঙ্কের বদলে উন্নয়নকে পাথেয় করেছেন এবং উন্নয়ন করে দেখিয়েছেন বলেই নরেন্দ্র মোদীর উপর ভোটব্যাঙ্ক- ব্যবসায়ীদের এরকম প্রচণ্ড রাগ। গত প্রায় বারো বছর ধরে এরা প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছে, বেগম তিস্তা শেতলবাদ নামক এক মহিলাকে যুদ্ধে নামিয়েছে, শুধু নরেন্দ্র মোদীর নামে কালি ছেটানোর জন্য, যাতে ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতির মুখোশ খুলে না পড়ে। কোনও লাভ হয়নি, মুখ পুড়েছে বেগম তিস্তা শেতলবাদেরই।

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা নরেন্দ্রভাই একেবারে প্রাঞ্জল করে বলেছেন তা হলো, সরকারের কাজ নয় ব্যবসা করা বা শিল্প করা। সরকারের কাজ হচ্ছে ব্যবসা এবং শিল্প তৈরির মতো পরিমণ্ডল তৈরি করা। সরকার যত বড় হবে, যত ব্যাপারে নাক গলাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তত খারাপ হবে। এই কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যা আজকে টুকরো টুকরো হয়ে রাশিয়া, ইউক্রেন ইত্যাদি নানা দেশে পরিণত হয়েছে। কি করেছিল এই সোভিয়েত ইউনিয়ন? না, তাবৎ শিল্প এবং ব্যবসা সরকারের হাতে রেখেছিল। বিশাল ইস্পাত কারখানা থেকে আরম্ভ করে পাড়ার মুদীর দোকান পর্যন্ত সবই ছিল সরকারি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এই সোভিয়েত ইউনিয়ন চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল। অথচ কি না বারবার চেষ্টা করেছিল এই দেশ! চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিল, অস্ত্রসম্ভারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল, দেশে বিদেশে নিজেদের গুপ্তচরবাহিনী কে জি বি-র মাধ্যমে সারা পৃথিবীটাকেই কব্জা করার তালে ছিল। শেষপর্যন্ত কিছুই টিকল না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই পতন থেকে চীন শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মাও জে দঙ-এর সরকারি মালিকানার নীতি ছেড়ে দেঙ জিয়াওপিং-এর বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণ করেছে। তার ফলে চীন আজ পৃথিবীতে প্রায়— বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। কিন্তু আমরা! আমরা ঠিকই করতে পারিনি কি করব। আমরা বেসরকারিকরণের পথে গেছি ঠিকই, নেহরু-প্রবর্তিত আত্মঘাতী সোভিয়েত ইউনিয়নের নকল করা ছেড়েছি ঠিকই, কিন্তু তা চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্তের ফলে নয়। যখন এই আত্মঘাতী অর্থনীতির ফলে আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেল তখন, ১৯৯০ সালে, আমরা দেশের সোনা বন্ধক দিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে টাকা ধার নিতে বাধ্য হলাম। তখন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের চাপেই আমরা বেসরকারিকরণ করলাম, যাতে তদানীন্তন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও এবং বর্তমান প্রধানন্ত্রী, সেসময়কার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তার পরে যখন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় এল তখন সেই নীতি অনুযায়ী চলার জন্য একটা বিলগ্নীকরণ দপ্তরও তৈরি হলো, যার মন্ত্রীপদে ছিলেন অরুণ শৌরী। কিন্তু ২০০৪ সালে এই সরকার ক্ষমতাচ্যুত হবার পরে সোনিয়া গান্ধীর সরকার এই রাস্তায় এক পা এগিয়েছে তো দু'পা পিছিয়েছে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি নেহরু-জমানার অর্থনীতির দুই-তিন শতাংশ থেকে আট-নয় শতাংশে পৌঁছেছিল তা আবার পাঁচ শতাংশে নেমেছে। এদিকে মূল্যবৃদ্ধি অটুট আছে।

এই সরকারি মালিকানার বিরুদ্ধে নরেন্দ্রভাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জনমানস বামপন্থী প্রচারে এত সম্পৃক্ত যে এই জিনিসটা--- সরকারি মালিকানা— কত খারাপ তা বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধা হয়। নিরন্তর বামপন্থী প্রচারের ফলে আমাদের অনেকেরই মাথায় ঢুকে গেছে যে সমাজতন্ত্র ব্যাপারটা বেশ ভাল জিনিস,

সরকারি মালিকানাও বেশ ভাল জিনিস। আদৌ তা নয়। সমাজতন্ত্র আজ সারা পৃথিবীতে পরিত্যক্ত, সরকারি মালিকানার প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারীকরণ সব দেশেই হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, শিল্প বা ব্যবসা চালাতে গেলে যে সৃজনীপ্রতিভা দরকার, সরকারি ব্যবস্থা তার টুঁটি টিপে ধরে— তার কারণ সরাকারি ব্যবস্থার প্রক্রিয়া বা procedure সব সময়ে ঠিক, যাকে বলে 'লেফাকা-দুরস্ত' হওয়া দরকার, ফল যা-ই হোক। এরকম করে যে শিল্প চালানো যায় না তা যারা শিল্প চালান তারা জানেন, পৃথিবী জুড়ে এটা প্রমাণও হয়ে গেছে। চীনের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়ক ঝু রংজি বলেছিলেন, সরকারি মালিকানা অর্থনীতির প্রাণচাঞ্চল্যই কেড়ে নেয়।

এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রভাই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে দিতে ইংরাজিতে বলেছেন, Less Government, more Governance। অর্থাৎ সরকার ছোট হলে সুশাসন সুনিশ্চিত হয়। এটাও বামপন্থী ধারণার একশো আশি ডিগ্রী বিপরীতে। কিন্তু সত্য। কেন সত্য? তার কারণ সরকারের আয়তন যদি প্রয়োজনের চাইতে বড় হয় তবে আমলারা ক্ষমতালোভী হয়ে যায় এবং অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে নিজেদের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করতে থাকে। তার ফলে অর্থনীতির স্বচ্ছন্দগতি বিঘ্নিত হয়, দুর্নীতিও ঢুকে পড়ে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ও বলতেন, যদি অভাব এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের সম্মিলন হয় তাহলে দুর্নীতি জন্মাবেই।

নরেন্দ্রভাইয়ের আর এক প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, technology upgradation-এর প্রয়োজন। বলছিলেন, আমেদাবাদ অঞ্চল একসময় কাপড়ের মিলে পূর্ণ ছিল। আজ তার বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে। কেন বন্ধ হয়ে গেছে? তার কারণ, আমরা প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারিনি। কিন্তু গুজরাত আজকে সেই সব শিল্পে পরিপূর্ণ যার কথা এর আগে কেউ ভাবতেই না। সে শিল্পগুলো কি করে হলো? আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহারেই সম্ভব হয়েছে। এখানেই গান্ধীজীর খাদি ও চরকা-নীতির ব্যর্থতা, যাকে আজ কংগ্রেস পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে। প্রযুক্তি প্রয়োজন, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণও প্রয়োজন। সময়কে কখনও পিছনে হাঁটানো যায় না, আমরা নগরায়ণ, কলকারখানার সংস্কৃতি ছেড়ে প্রাচীন যুগের সরল জীবন যাত্রায় ফিরে যাব, গোরুর গাড়ি চড়ব এবং রেড়ির তেলের বাতি জ্বেলে plain living and high thinking করা, এসব ভাবা বাতুলতা।

এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রভাই স্বাদেশিকতার যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। স্বাদেশিকতা, স্বদেশীয়ানা আমরা সবাই চাই— কিন্তু তা আজকের যুগোপযোগী স্বাদেশিকতাই হবে, উনিশ-শো ত্রিশের দশকের স্বদেশী হবে না। আমি কিছু লোককে দেখেছি, যারা 'কলগেট' টুথপেস্ট ব্যবহার না করে, 'প্রমিজ' টুথপেস্ট ব্যবহার করাকে স্বদেশীয়ানা মনে করেন। তার কারণ 'প্রমিজ' ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের তৈরি। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাই, এই ধারণা ভ্রান্ত। আমি এরকম একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলুন তো 'লারসেন অ্যান্ড টুব্রো' (ভারতের শিল্পগোষ্ঠীগুলির প্রথম সারির একটি) স্বদেশী না বিদেশী? তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই বিদেশী! উত্তর ভুল, এটি একটি পুরোপুরি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, যদিও এর গোড়াপত্তন করেছিলেন একজন ডেনিশ ভদ্রলোক। তেমনি, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানী নামে 'ইন্ডিয়া' হলেও, এর বেশিরভাগ শেয়ার আগে ছিল বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর হাতে। বস্তুত, আজকের বিশ্বায়নের যুগে, যখন এবেলা- ওবেলা কোম্পানীর শেয়ার (অর্থাৎ মালিকানা) এহাত থেকে ওহাতে চলে যায়, তখন কে স্বদেশী কে বিদেশী তা বোঝা অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ ব্যাপার।

তাহলে কি আমরা স্বাদেশিকতা করব না? অবশ্যই করব, কিন্তু আজকের যুগের সঙ্গে তাল রেখে বিশ্বায়ন মাথায় রেখে, উনিশশো বিশ-ত্রিশের আদলে নয়। এই স্বাদেশিকতার ফলেই যে বিশ বাজার একসময় বৃটিশ জিনিসের রমরমা ছিল তার জায়গা নিয়ে নিল প্রথমে যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানী, তারপর আর এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ জাপান, তারপর আরও এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। আজকে সকলকে হটিয়ে দিতে চলেছে চীন। আমরা কেন নই? যে আমেরিকা ছিল মোটরগাড়ি তৈরির পীঠস্থান সেখানে আজ মার্কিন ছোট গাড়ি দেখাই যায় না— তার জায়গা নিয়ে নিয়েছে জার্মানী, সুইডেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া। ভারত নয় কেন? আজকের দিনে এটাই স্বদেশী, এটাই স্বাদেশিকতা। ভারত পণ্য উৎপাদন করবে, বিদেশের বাজারে বিক্রি করবে, ভারতের মাটিতে কর্মসংস্থান হবে, ভারতীয় শ্রমিক ধনবান হবে। এই কথাও নরেন্দ্রভাই প্রাঞ্জল করে বক্তৃতায় বলেছেন। সেইসঙ্গে বলেছেন, আমরা শুধু পণ্য রপ্তানী করব না, আমরা শিক্ষক রপ্তানী করব। সেই শিক্ষকেরা বিদেশের এক-একটা প্রজন্মকে আমাদের ভাবধারায় শিক্ষিত করবে।

নরেন্দ্রভাই বলেছেন, এক সময় ছিল যখন 'মেড ইন জাপান' দেখলেই আমরা জিনিসটাকে ভালো ভেবে কিনে নিতাম, কোনও কোম্পানীর তৈরি তাও দেখতাম না। কেন ভবিষ্যতে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এই জায়গায় পৌঁছতে পারবে না? বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ছোট দেশ, উত্তরপ্রদেশের চেয়েও ছোট, শুধু একটা অলিম্পিক করে সারা পৃথিবীর প্রশংসা অর্জন করল, তার ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় তৈরি জিনিস সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হলো। আমরা কেন তেমন পারব না? এর নাম 'ব্র্যান্ডিং', এটা বিশ্বায়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এটা আমাদের করতেই হবে।

পুরো এক ঘণ্টার একটি বক্তৃতায় বলা প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা একটি নিবন্ধে সম্ভব নয়। যাঁরা ইন্টারনেট করেন তাঁদেরকে অনুরোধ করছি, নীচে উল্লিখিত ওয়েবসাইট-এ গিয়ে পুরো বক্তৃতাটা মন দিয়ে শুনুন। বক্তৃতার একটি জিনিস কিন্তু পুরোটা শোনার পরেও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করতে থাকবে। তা হলো, বক্তার চিন্তার স্বচ্ছতা। আমরা অনেক সময়েই নিজেদের চিন্তার জালে নিজেরাই জড়িয়ে যাই, একমুখী চিন্তা করতে পারি না। সেদিক দিয়ে নরেন্দ্রভাই এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, অনুকরণযোগ্য ব্যতিক্রম। তাঁর চিন্তা পুরোপুরি একমুখী। এবং সেই অভিমুখের নাম উন্নয়ন, উন্নয়ন, উন্নয়ন।

[নরেন্দ্র মোদীর সম্পূর্ণ বক্তৃতা শোনা যাবে www. youtube.com/ watch ?v=fW2cbSnuCco এই website-এ। এছাড়া google. com-এ গিয়ে Narendra Modi+SRCC দিয়ে search করলেও পাওয়া যাবে]

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নারী স্বাধীনতার চেয়ে নারী-সম্মান রক্ষাই ভারতীয় সংস্কৃতি

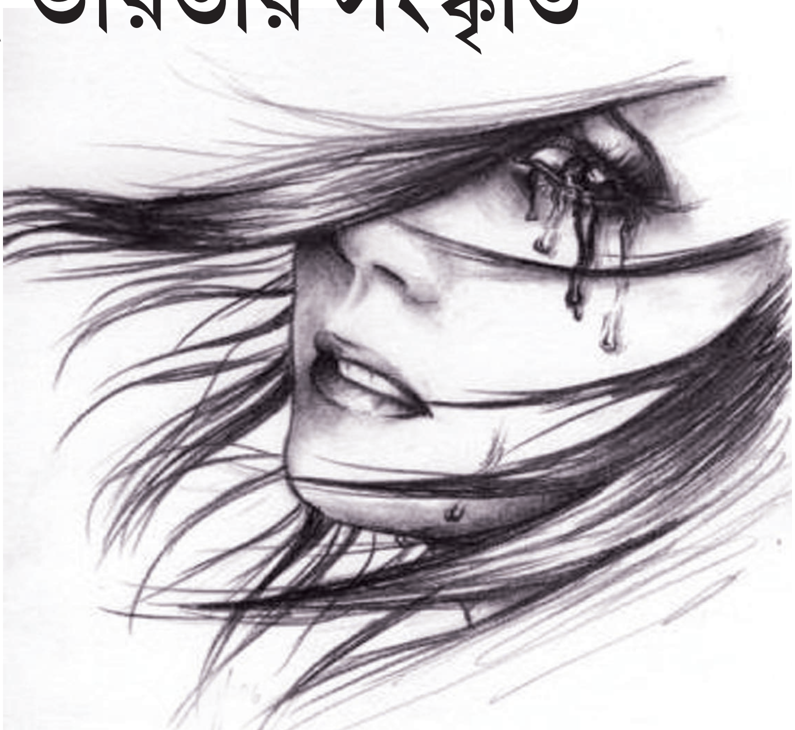

এন. সি. দে

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO) গঠিত হওয়ার পর থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদ তার উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের নয়া ধ্বজা উড়িয়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল, অনুন্নত এবং দরিদ্র দেশগুলির শুধু অর্থনীতি নয়, রাজনীতি নয়, সংস্কৃতির উপরও আক্রমণ করছে। এ ব্যাপারে তারা সাহায্য পাচ্ছে গরীব দেশগুলির প্রচার মাধ্যমের (খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল প্রভৃতি)। তাদের সংস্কৃতি-বিরোধী অপপ্রচারকে প্রামাণ্য করে তুলতে বাজারে নেমেছে বুদ্ধি বিক্রয়কারী একদল সংস্কৃতিবিরোধী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীও। বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ বিধ্বংসী আক্রমণে নেমেছে। সে আজ উদার বিশ্ব গড়ার ধ্বজা তুলে তাদেরই আশ্রিত এক ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ তৈরির চক্রান্ত করছে, সেখানে থাকবে না কোনও আলাদা সংস্কৃতি, থাকবে কেবল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, যার নিয়ামক হবে পুঁজিবাদ। সবাই এবং সবকিছু হবে পুঁজির অধীন। সকলের পরিচয় শুধু পণ্য। মাতা-পিতা ভাই-বোন, পুরুষ-মহিলা সকলের সম্পর্কের বিচার হবে পণ্য হিসাবে, যে পণ্যের মূল্য বেশী পুঁজিবাদের কাছে তার মূল্যই বেশি।

মানব-সভ্যতার শোষণের ইতিহাসের ধারাবাহিককতায় সবচেয়ে বিপজ্জনক অধ্যায় এই পুঁজিবাদ। পূর্বের সকল তন্ত্রের মধ্যে এই পুঁজিতন্ত্রই সবচেয়ে ধূর্ত। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে তার আগমন ফরাসী বিপ্লবের ‘সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা’-র পতাকা হাতে। মানব ইতিহাসে মানব সন্তান সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হয় এই স্বাধীনতার বুলিতে। কারণ স্বাধীনতায় নেই নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণহীন জীবন-যাপনে মানুষের অমোঘ আকর্ষণ। পুঁজিবাদ এই নিয়ন্ত্রণহীন মানুষকে বেশি পছন্দ করে কারণ নিয়ন্ত্রণহীন মানুষই অমিতব্যয়ী। আর অমিতব্যয়ী মানুষ পুঁজিবাদীদের বড় খরিদ্দার। তাই পুঁজিবাদ তাদের জয়যাত্রার শুরুতেই তাদের কাছে বিক্রিত দার্শনিক ইপিকিউরাসের দর্শনকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। সেই দর্শন হলো : ‘Eat, drink and be merry’ অর্থাৎ ‘খাও-পিও আর জিয়ো’। শুধু ভোগ, ভোগ আর ভোগ। এই ভোগবাদই (consumer-ism) পাশ্চাত্য পুঁজিবাদই দর্শন। ডারউইন-এর অস্তিত্ব তত্ত্বও তাই পুঁজিবাদের খুব পছন্দ। পুঁজিবাদের জয়যাত্রায় সেদিন ডারউইন-এর দর্শনকেও পুঁজিবাদ কাজে লাগিয়েছিল। কী সেই দর্শন? সেটি হলো— Survival of the fittest তত্ত্ব। যার মোদ্দা কথা হলো— fittest (ক্ষমতাবান)-রাই শুধু Survive করবে (বাঁচবে)। এতো জঙ্গলের তত্ত্ব। অ্যারিস্টটলের দর্শন ‘Man is the national animal’ কথাটি পুঁজিবাদের সহায়ক কারণ মানুষও পশু, তবে বুদ্ধিমান। মানুষকে নগ্ন নারী দেখিয়ে পাশবিক বেহিসেবি, মত্ত, অমিতব্যয়ী ও পাশবিক করে তোলাতেই পুঁজিবাদের ফায়দা। তাই স্বাধীনতার টোপ দিয়ে নারীকে ঘরের বাইরে আনা। যার পরিণতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে আমাদের দেখিয়েছেন। নারীকে স্বাধীনতার নাম করে নিয়ন্ত্রণহীন করে তুলতে পারলে অনেক দিকেই লাভ।

নারীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল FMCG (Fast Moving Consumer Goods)-এর বাজার। ফ্যাসান-বিউটিপার্লার, জুয়েলারি আর মনোহারী অঙ্গসজ্জার রকমারি ব্যবসা। আর তাদেরই সাজিয়ে- গুজিয়ে নগ্ন পোশাকে আকর্ষণ করা

হচ্ছে তরুণ, যুবক পুরুষদের। চলছে নারীকে পণ্য বানিয়ে পরিবেশন। এক ঢিলে দুই পাখি মারা। পুঁজির দাপটে স্বাধীন নারী এখন পুঁজিবাদের অধীন এক মুখ্য পণ্য। পাখি দিয়ে পাখি ধরার কৌশল। তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বার (BAR) আর পাব (PUB) কালচার। নারীর খোলা অঙ্গসৌষ্ঠবে পুরুষের লালসা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজির বিকাশ ও অগ্রগমন। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর উন্মুক্ত স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে চড়ানো হচ্ছে পাশবিক করে তোলা এপিকিউরিয়ান পুরুষদেরই।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীর সম্মান সবচেয়ে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। অসংখ্য বিদুষী নারীর নাম ভারতীয় বৈদিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান। কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপা, নারী দেবীস্বরূপা, আদ্যাশক্তি মহামায়াস্বরূপা। আজও আমাদের সংসারে মা ও স্ত্রীরই প্রাধান্য। তাদেরই ইচ্ছায় সংসার পরিচালনা করে পুরুষ। তবে সামাজিক সাংসারিক সম্পর্কের সীমা কেউ কখনও লঙ্ঘন করে না। এটা পারস্পরিক প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী সংসারে স্বাধীন কিন্তু সংসারের বাইরে সে অরক্ষণীয়া থাকতে পারে না কারণটা শারীরিক এবং প্রাকৃতিক।

প্রকৃতিগত ভাবেই নারী নরম মনের অধিকারী, পরদুঃখকাতর, সহজেই বিশ্বাসী এবং স্পর্শকাতর। তাই তার বুদ্ধি এই সমস্ত গুণ বা অপগুণ দ্বারা আবৃত। এই কারণেই নারী কখনও পিতার অধীন, কখনও বা স্বামীর অধীন। আজও মেয়েকে বাবা বা মা সঙ্গে নিয়ে স্কুল বা শিক্ষকের কাছে যায়। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে দেখা যায়। এর মানে অধীনতা নয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অধীনতা মানে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ আমাদের সংবিধান-স্বীকৃত। সংবিধানে অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে কর্তব্যেরও কথা। 'Right implies duties'। অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত। স্বাধীনতা কখনই উদ্দাম ভারসাম্যহীন অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। সামাজিক সম্পর্কের ভারসাম্যকে নষ্ট করা স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হতে পারে। পশ্চিমী পুঁজিবাদী সমাজের কাছে ভারতের সমাজ ও সম্পর্কের মজবুত বনিয়াদ সব সময়েই ছিল ঈর্ষার বস্তু।

বহু ঐতিহাসিকের মতে, ওরা ভারতের মানুষের কাছে যত না প্রতিরোধের মুখে পড়েছে, তার চেয়ে কেউ পড়েছে এই সামাজিক কাঠামোর শক্ত দেওয়ালের প্রতিরোধের মুখে।

পশ্চিমী পুঁজিবাদের উদ্দাম স্বাধীনতার দাপটে আজ আমাদের সামাজিক কাঠামো অনেকটাই শিথিল। ইংরেজ এদেশে এসেই এই প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিল। অনেকাংশে সে সফল। তাই আজ থেকে প্রায় ৬০ বছরের আগে লেখা 'শিক্ষার ভিত্তি' পুস্তক লেখক বনফুল লিখে গেছেন, "প্রকৃত সমাজ বলিতে যাহা বোঝায় সে সমাজ বহু পূর্বেই অবলুপ্ত হইয়াছে। বয়স্ক যুবকেরা বিবাহ করিতে চান না, কিন্তু তাঁহারা সন্ন্যাসীও হইয়া যান নাই। বিবাহ করিলে যে সব সুখ-সুবিধা আনন্দ পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা কোনও দায়িত্ব বহন না করিয়াই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছেন।"

গৌতম বুদ্ধও প্রথম জীবনে বৈদিক বর্ণভিত্তিক (শ্রমভিত্তিক) সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে যে ভেদাভেদহীন উদার সংঘ জীবন চালু করেছিলেন, সেখানে সংঘে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের নানা কুফল তিনি শেষ জীবনে নিজে প্রত্যক্ষ করে কষ্ট পেয়ে গেছেন। তাঁর নিজের পক্ষেও আর নারী-সংস্রব পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। বনফুল লিখছেন, "ব্যাধকন্যা গোপা হইতে শুরু করিয়া শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখা, অনাথপিণ্ডদসূতা সুপ্রিয়া, চুল্ল সুভদ্রা, কৃশা গৌতমী, সুজাতা, চৌরবধূ ভদ্রা কুণ্ডলকেশা বৈশালীর গণিকা আম্রপালী (বা অম্বপালী), বাগ্মিনী নন্দুওরা প্রভৃতি অনেক রমণীই তাহার পর ভগবান বুদ্ধের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।... সংঘ প্রবেশের অনুমতি পাইয়া অনেক নারীই যে সেখানে গিয়া স্বেচ্ছাচার করিত তাহারও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে গিয়া তাহারা গোপনে সুরা পান পর্যন্ত করিত। বিশাখার অনুরোধে একবার কয়েকটি মহিলাকে উপদেশ দিতে গিয়া বুদ্ধদেব লক্ষ্য করিলেন যে তাহাদের এমন মত্তাবস্থা যে তাহারা টলিয়া পড়িতেছে।" মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি তার শিষ্য আনন্দকে নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে গিয়েছিলেন— 'আনন্দ, স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাইও না।' 'বাক্যালাপ করিও না।' ইত্যাদি।

বৈদিক সমাজের শিক্ষা ছিল আদর্শ শিক্ষা। ইংরেজ এদেশ দখল করেই ভেঙ্গে দিয়েছে সেই সমাজ শিক্ষা, যার উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের বিকাশ, পশুত্বের বিনাশ; এনেছে পশ্চিমী পুঁজিবাদী সহায়ক শিক্ষা যার উদ্দেশ্য অর্থ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। লোভ, মোহ ও মাৎসর্য সৃষ্টি যার স্বাভাবিক পরিণতি। উপনিষদের ঋষি শিখিয়েছিলেন "সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কস্যচিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ" (যা কিছু ভদ্রোচিতো তাই সকলের দেখা উচিত। কখনও কারো দুঃখভোগের কারণ হয়ো না)। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্" (সবটুকু ভোগ করো না, পরের জন্যও কিছুটা রেখে দিও অর্থাৎ ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করো, পরের ধনে কখনও লোভ করো না)।

এই নৈতিক শিক্ষা আজ অপসৃত, তাই অবহেলিত শ্রেণীর অপরিণত কিশোর, তরুণ ও যুবকরা আজ পরের দ্রব্যে লোলুপ হয়ে উঠেছে। আর তাদের কয়েকজনের জন্য নারীবাদী আন্দোলনের নামে পুরুষ বিদ্বেষ চালু হচ্ছে। নারীকে ক্রমশই পুরুষের প্রতিযোগী হয়ে উঠতে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। সহযোগী ও পরিপূরক সম্পর্ককে বিষাক্ত করা হচ্ছে।

ভারতকে বাদ দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সম্ভব নয়। "ভারতবর্ষ জ্ঞানে গরিমায় যখন সত্যই বড় ছিল, তখন সে সত্যই স্বাধীন ছিল" (বনফুল)।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান
স্বস্তিকা
প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাব রুখতে না পারলে ধর্ষণ মহামারীর আকার ধারণ করবে

সাধনকুমার পাল

গত ১৬ ডিসেম্বর রাতে দিল্লীর বুকে ২৩ বছরের মেডিকেল ছাত্রী দামিনী ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনার পর থেকে শুধু ভারতে নয় বিশ্বজুড়ে এই নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সকলের সমবেত শুভেচ্ছা, প্রার্থনা ও চিকিৎসকদের অক্লান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও প্রায় দু' সপ্তাহের অসম লড়াইয়ে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে দামিনীকে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই ধরনের জঘন্যতম অপরাধ যাতে আর সংগঠিত না হয় তার জন্য প্রশাসনিক ও আইন সম্বন্ধীয় নানা সংস্কার, ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড, মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য জুডো-ক্যারাটে শেখানো, আত্মরক্ষার জন্য মহিলাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র রাখার মতো নানা সুপারিশ সহ দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ আছড়ে পড়ার নানা খবর সংবাদমাধ্যমে আসছে।

যারা একটু খুঁটিয়ে সংবাদে চোখ রাখেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সংবাদমাধ্যমে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের খবরের পাশাপাশি প্রতিদিনই জায়গা করে নিচ্ছে ধর্ষণের নতুন নতুন খবর। চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষক, উচ্চপদে কর্মরত আধিকারিকের মতো সমাজের সমঝদার মানুষ থেকে শুরু করে কে নেই জনসমক্ষে আসা এই সমস্ত ধর্ষণে অভিযুক্তদের তালিকায়? এ থেকে এটি পরিষ্কার যে মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তির ভয়, সামাজিক ঘৃণা কিংবা জনরোষের ভয় অপ্রকৃতিস্থ ধর্ষকদের উপর খুব একটা প্রভাব বিস্তার করে না। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দিল্লির ঘটনার পর প্রশাসনিক, আইন সম্বন্ধীয় সংস্কার বা মহিলাদের আত্মরক্ষা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত সুপারিশ এসেছে তার প্রায় সবগুলিই ধর্ষণের মতো অপরাধ দমনে আধুনিক ভাবনা-চিন্তার অনুসারী এবং এগুলির কার্যকর করার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু এগুলির কার্যকর করলেই যে এই ধরনের অপরাধে লাগাম দেওয়া যাবে সে কথা কিন্তু হলফ করে বলা যাবে না।

তথ্য পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে দেখা যাবে ভারতের চেয়ে আমেরিকার আইন ও বিচার ব্যবস্থা এবং মহিলাদের স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়, সংবেদনশীল, তৎপর ও উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ওই দেশে প্রতি নয় সেকেন্ডে একজন মহিলা ঘরোয়া হিংসার শিকার হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০০৬-এ ধর্ষণের

দিল্লী ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে মুখর দেশবাসী।

বিশ্ব পরিসংখ্যানে ভারতের র‍্যাঙ্ক ৬৮ আর আমেরিকার ৫। যা কিনা ভারতের থেকে ১৭ গুণ বেশি। ২০১০-এর এক পরিসংখ্যান বলছে আমেরিকার প্রতি ৫ জনে একজন মহিলা ধর্ষণের শিকার। ওই দেশে ধূমপায়ীর চেয়ে ধর্ষিতা মহিলার সংখ্যা বেশি। উন্নত দেশ বলে পরিচিত কয়েকটি দেশ ও ভারতের প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যা প্রতি ধর্ষণের পরিসংখ্যান সারণীতে দেওয়া হলো। (সারণী দ্রষ্টব্য)

সারণীতে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিচার করলে এটা বলতে হবে যে উন্নত দেশগুলিতে ধর্ষণ মহামারীর আকার ধারণ করলেও ভারতে সেই মহামারীর সূচনা মাত্র হয়েছে। বিশ্বায়নের কুপ্রভাব ভারতীয় সমাজেও এই ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধের আত্মীয়করণ হচ্ছে কিনা সে নিয়ে বিতর্ক ধরনের ভয়ঙ্কর মানসিকতা। এই দূষণ এখন যেন গা-সওয়া ব্যাপার। সিমেন্ট বা সেভিং ব্লেডের মতো হার্ডওয়ার দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপনেও অর্ধনগ্ন নারী শরীর দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সংবাদ-শিরোনাম দেখার আগে নিজের শিশু কিশোর সন্তানদের পাশে বসিয়ে যৌন উত্তেজক মালিশের তেলের বিজ্ঞাপন দেখতে, দিনের সংবাদপত্রের সংবাদ পাঠ ধর্ষণের খবর দিয়ে শুরু করতে আমরা অভ্যস্ত।

এই ধরনের মালিশের তেলের বিজ্ঞাপন বা সংবাদপত্রে ধর্ষণের খবরাদি দেখে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদের মধ্যে কি ধরনের কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছে বা বিজ্ঞাপনে অর্ধনগ্ন নারী শরীর দেখতে দেখতে যাচ্ছে। যা থেকে সবার অলক্ষ্যে সমাজের একটি বড় অংশের মনে গড়ে উঠছে ধর্ষকাম মানসিকতা। সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয়ে তিলতিল করে গড়ে উঠা এই ধর্ষকাম মানসিকতা সামান্য সুযোগ পেলেই ধর্ষণ নামক আকস্মিক বড় খবরে পরিণত হচ্ছে।

উপরের সারণীতে যে সমস্ত দেশের ধর্ষণ পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে এই দেশগুলির প্রত্যেকটিরই স্কুল পাঠ্যসূচীতে যৌন শিক্ষা আবশ্যিক। ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই সমস্ত দেশে যৌন শিক্ষার নামে মূলত ঝুঁকি মুক্ত যৌন মিলনের শিক্ষাই দেওয়া হয় যা কিনা ওই সমস্ত দেশে ধর্ষণ মহামারি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রয়াত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখায় পড়েছিলাম আমেরিকায় নাকি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ যৌন মিলনকে

সারণী

দেশ/বছর	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
ভারত		১.৬	১.৬	১.৭	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮
জার্মানি	১০.৬	১০.৭	৯.৯	৯.৮	৯.১	৮.৮	৮.৯	৯.৪
ফ্রান্স	১৭.৩	১৭.৩	১৬.৪	১৫.৯	১৬.৪	১৬.৪	১৬.৫	১৬.২
ইউ কে	২৫.১	২৬.৪	২৭.০	২৫.৬	২৩.৪	২৪.৪	২৭.৫	২৮.৮
ইউ এস এ	৩২.২	৩২.৩	৩১.৮	৩১.৫	৩০.৬	২৯.৮	২৯.০	২৭.৩

চলতে পারে। তবে এদেশের ডাকাত লুটেরাদের মধ্যেও যে মহিলাদের সম্মান করার সংস্কৃতি চালু ছিল এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আজকের দিনে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে জনবহুল এলাকাতেও কোনও একজন মহিলা দুষ্কৃতীদের লালসার শিকার হলে নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ভয়ে নীতিবান লোকেরাও প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।

মনে রাখতে হবে যৌনতা যতটা শারীরিক ব্যাপার তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক ব্যাপার। ধর্ষণকাম মানসিকতা তৈরির রসদ লুকিয়ে আছে বর্তমান সাংস্কৃতিক দূষণের মধ্যে। একদিনে নয়, এই দূষণের মধ্যে তিলতিল করে গড়ে উঠে এই মহিলাদের সম্মান করার মানসিকতা নষ্ট যে হয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা কতটা সচেতন। পারিবারিক সচেনতা ও সজাগ দৃষ্টির অভাবে অন্ধকার জগতের একশ্রেণির ব্যবসায়ীর দৌলতে দু-পাঁচ টাকার বিনিময়ে আমাদেরই ঘরের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মোবাইলের মেমোরিতে ঢুকে যাচ্ছে নীল ছবির হরেক স্বাদের ক্লিপিং। একটু খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের নীল ছবি উপভোগ করা এখন এদেশেও মহামারীর আকার ধারণ করেছে। বাণিজ্যিক স্বার্থে নারী শরীরের এই ধরনের বিপণনে 'নারী শরীর' মানেই ভোগের বস্তু এরকম একটি ধারণা প্রাপ্ত থেকে শুরু করে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের একটি ভালো অংশের মনে গেঁথে উৎসাহিত করার জন্য টয়লেটগুলিতে কন্ডোম পর্যন্ত রাখা হয়। উপরের পরিসংখ্যানের এই সংক্ষিপ্ত তালিকা ছেড়ে ধর্ষণের বিশ্ব পরিসংখ্যান সামনে রাখলেও এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে।

আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় চিন্তাবিদ ও দার্শনিক কখনও কামসূত্র নামক যৌন বিজ্ঞানের জন্মদাতা ভারতে স্কুল পড়ুয়াদের যৌনশিক্ষার আয়োজনের কথা বলেননি। কিন্তু পশ্চিমি হাওয়া ও অর্থের প্রভাবে ভারতেও এখন যৌন-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির নামে পড়ুয়াদের যৌনশিক্ষার পক্ষে জোরদার সওয়াল করে এদের অকালপক্ক করে গড়ে তোলার প্রয়াস হচ্ছে। শুধু সওয়ালই নয় ভারতীয় সমাজ

সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন হলেও এদেশের বিস্তীর্ণ অংশে স্কুল সিলেবাসের মাধ্যমে যৌন শিক্ষাকে কার্যকর করার এক ব্যর্থ প্রয়াসও লক্ষিত হচ্ছে।

দিল্লীর ঘটনার পর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গোটা দেশ ফুঁসে উঠছে। সন্দেহ নেই এটা অত্যন্ত ভালো লক্ষণ। মনে রাখতে হবে শুধু উপর উপর নয় সমস্যার মূলে গিয়ে আঘাত হানতে হবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ফুঁসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যৌনতার বাণিজ্যিকরণ, কুৎসিত সংস্কৃতি যা কিনা নিঃশব্দ ঘাতকের মতো নীরবে, নিঃশব্দে ধর্ষকাম মানসিকতা তৈরি করে যাচ্ছে, সেসবের বিরুদ্ধে। যৌনশিক্ষা নয় যোগ শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মতো কালোত্তীর্ণ ভারতীয় ব্যবস্থাগুলিকে ফিরিয়ে আনার জন্যও আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের নামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তথাকথিত উন্নত দেশগুলির অন্ধ অনুকরণ ছাড়তে হবে। কারণ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের নিজস্ব পথ ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এই সমস্ত উন্নত দেশের বিকাশের পথ যদি ভারতেরও পথ হয় তা হলে সেই পথের আলোটুকু নেব অন্ধকারটুকু নেব না, তা হয় না।

সব মিলে বলা যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এমনকি জীবন দর্শনের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করলে ঐসমস্ত দেশের মতো ভারতেও যে ধর্ষণ মহামারীর আকার ধারণ করবে এরকম একটি ভবিষ্যৎ-বাণী বোধহয় করে রাখা যায়।

সারণী-২

রাজ্যে ধর্ষণের খতিয়ান

বছর	নথিভুক্ত ধর্ষণের অফিযোগ	চার্জশিট হয়েছে
২০০৭	২,১০৬	১,৭৪১
২০০৮	২,২৬৩	১,৬৫৫
২০০৯	২,৩৩৬	১,৮২৮
২০১০	২,৩১১	১,৭৬৮
২০১১	১,৩৪৭	৫২৮
		(প্রথম ৬ মাসে)

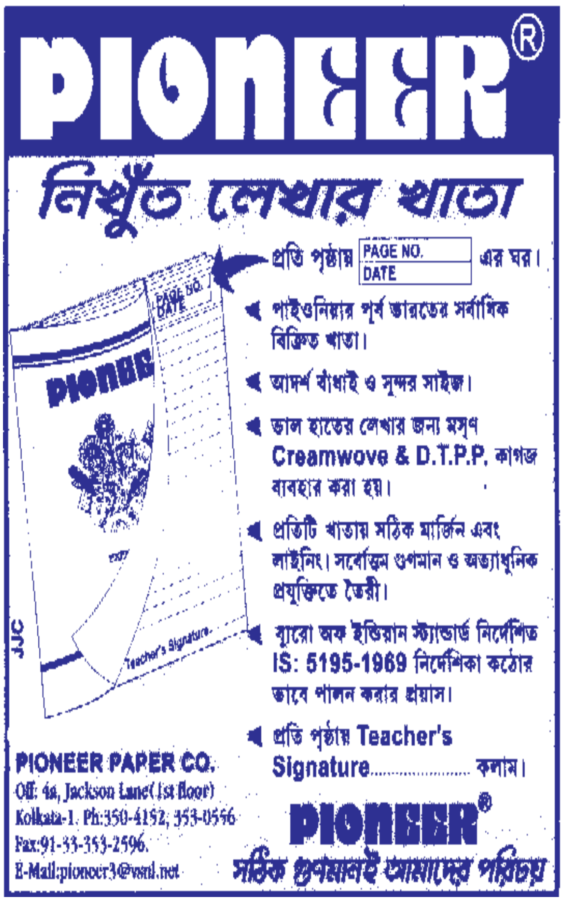

চিঠিপত্র

শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই

শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইকে (স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী) আমি প্রথম দেখেছি ১৯৬৯ সালে বেলডাঙা হাই স্কুলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে। আমি তাঁর ভাষণও শুনেছি। তাঁর সহজ সরল সুন্দর মূল্যবান ভাষণ স্বয়ংসেবকদের প্রেরণা যোগাত। তাঁর বিলাসহীন অনাড়ম্বর চেহারা এখনও চোখের সামনে ভাসছে।

তিনি ছিলেন নিরলস ত্যাগী পুরুষ। তিনি একবার মাননীয় বংশীলাল সোনী (সঙ্ঘের তৎকালীন মালদা বিভাগ প্রচারক) ও কয়েকজন বনবাসী ধর্মগুরুর সঙ্গে তিলভোগ সর্দারপুর থেকে দীর্ঘ ১২ কিমি. পথ পায়ে হেঁটে চিৎকোল শাখাতে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী। কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭৩ সালে মালদা জেলার চিৎকোল গ্রামে 'রামকৃষ্ণ শিক্ষা নিকেতনের "(জুনিয়র হাই) প্রতিষ্ঠা করেন। বংশীদা ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বংশীদার প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই ও তৎকালীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাউরাও দেওরস ১৯৭৪ সালে এই রামকৃষ্ণ শিক্ষানিকেতন দেখতে গিয়েছিলেন। এই স্কুলটি গত ১৯৮২ সালে হাইস্কুলের অনুমোদন পায়। বর্তমানে এটা এলাকায় সুন্দর রূপে পরিণত হয়েছে। উক্ত মনীষীদের আশীর্বাদ না পেলে এটা হয়তো সম্ভব হোত না।

তিনি সকলের নমস্য। আমি তাঁর ত্যাগ ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

—**নিখিলচন্দ্র মজুমদার, সহ-সভাপতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মালদা।**

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার

'আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়' শীর্ষক নিবন্ধে (স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা-১৪১৯) ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী বলেছেন— 'আমাদের সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকের দল হিংস্র দানবপ্রকৃতির মোগল সম্রাট সাহজাহানকে একজন কোমল স্বভাবের প্রেমিক এবং বিশাল এক স্থপতি হিসাবে প্রচার করে চলেছেন। তাঁর ওই মন্তব্যের সূত্র ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় (জেনারেল এডিটর) রচিত The History and Culture of the Indian People-(Vol. vii)। ওই থেকে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রমেশচন্দ্র মজুমদারও একজন সেকুলারবাদী ঐতিহাসিক ছিলেন। ওরকম ভাবা ঠিক হবে না। বস্তুত, ডঃ ব্রহ্মচারীর উদ্দিষ্ট সেকুলারবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর বিচারে রমেশচন্দ্র মজুমদার মুসলমান বিদ্বেষী ঘোর সাম্প্রদায়িক একজন ঐতিহাসিক। উক্ত গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য রামশরণ শর্মা তাঁর Communal History and Rama's Ayodhya (1990) পুস্তিকাতে ওই একই সূত্র— The History and Culture of the Indian People— উল্লেখ করে রমেশচন্দ্র মজুমদারকে "the great revivalist anti-Muslim historian" বলে উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন "Majumder was a vocal exponent of the communalist approach to history" (pp. 17, 8)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার অবশ্য ওই সব নিন্দাবাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর শুধু আক্ষেপ ছিল, রাজনৈতিক নেতাদের মতো ঐতিহাসিকদেরও ইতিহাস-বিকৃতির রোগে ধরেছে ("It is very sad that the spirit of perverting history to suit political views is no longer confined to politicians, but has definitely spread even among professional historians" (H.C.I.P.-Vol. vii, p. xii)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত শতকের সত্তরের দশকে ভারত সরকার The History and Culture of the Indian People গ্রন্থরাজি সব প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল বাদে তথাকথিত সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকদের নিয়ে গঠিত 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ' ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।

কারণ হিসাবে বলা হয় 'বিদ্যাভবন'-এর গ্রন্থসকল একটি বিশেষ দোষে দুষ্ট ("...the vidya Bhavan series have a particular Stant and therefore the proposed translation should not be encouraged or officially sponsored")। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, উক্ত 'Slant' শব্দটির নিহিত অর্থ, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে সরকারি অবস্থানের সঙ্গে মতভেদ ("...that the 'slant' is the non-acceptance of the official view about the relation between the Hindus and Muslims and allied topics."--('History of Mediaeval Bengal'-- Dr. R.C. Majumder ; pp. viii-ix)।

ডঃ ব্রহ্মচারী যে অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি (নং ৮ এবং ৯) ভিত্তি করে তোপ দেগেছেন, সেটির বিষয়বস্তু 'Mughul Architecture'। স্বাভাবিক ভাবেই, অধ্যায়টির লেখক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এস. কে. সরস্বতী সেখানে মোগল বাদশাদের ধর্মান্ধতা, নিষ্ঠুর প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেননি। ডঃ ব্রহ্মচারী তাঁদের যে 'আসল চেহারা'র কথা বলেছেন সেসব বিষয় গ্রন্থটির অন্যত্র (পৃ. ২১৮-১৯; ২৩৩-৩৬; ৩০৫-৭) উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি, মোগল, পাঠান, তুর্কিদের শাসনকালে হিন্দুদের সংকটাপন্ন অবস্থার কথা রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্ত গ্রন্থরাজির ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে 'হিন্দু মুসলিম রিলেশনস্' শীর্ষক নিবন্ধসমূহে বিশদভাবে বলেছেন।

—**বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।**

নারী-জাতির অবমাননা
বর্তমান ভারতীয় সমাজের কলঙ্ক

রণজিৎ সিংহ

দেখতে দেখতে আমাদের পরম প্রিয় এই 'প্রাচীন ভূমি', আমাদের 'মাতৃভূমি' ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৬৪ বছর কেটে গেছে। বৃটিশ পরাধীনতামুক্ত এই 'পুণ্যভূমি' নিশ্চিত গত ছ' দশকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সড়ক, পরিবহন ব্যবস্থা, তারই সঙ্গে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গিক সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। দেশের এই 'জয়যাত্রার' জন্যে প্রতিটি দেশবাসী স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত, আনন্দিত। কিন্তু সমস্ত দুধের মধ্যে একটু চোনা থাকলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়— সেই দুধ পান করা যায় না! আমাদের প্রিয় 'মাতৃভূমির' এত বড় বৈষয়িক প্রগতি সত্ত্বেও, সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালে 'নারী জাতির অবমাননা', তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন, যার পরিণামে জীবনহানি, দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনকে করে তুলেছে গভীরভাবে 'কলঙ্কিত'। প্রকৃতপক্ষে ভারতের আর্থিক অভ্যুদয় বর্তমান বিশ্বের অনেক বড় বড় সমৃদ্ধ দেশের চক্ষুশূল! এই সকল দেশ ভারতের অগ্রগতিকে আটকাতে সুযোগ-সুবিধে পেলেই নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। সেখানে আমাদের দেশের স্ত্রী-জাতির প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ, ভোগবাদী ওই সকল দেশের মানুষজনের কাছে 'মজার বৈঠকী আলাপের বিষয়' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশভক্ত নাগরিকদের লজ্জা ও বেদনা আরও বেড়ে গেছে।

অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মহিলাদেরও তিনটি ভূমিকা আছে--- কন্যা-ভগিনী, স্ত্রী ও মাতা। কিন্তু লক্ষণীয় এখানে কন্যা-সন্তানদের 'মা' বলেই আমরা বিশেষভাবে সম্মান দিয়ে থাকি ও দেখি। এই উচ্চ আসনেই দেশের নারী জাতি অভিষিক্ত, প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত। আজকে গভীর দুঃখদায়ক ও পরিতাপজনক হলেও সেই 'শ্রদ্ধার' আসনকে দীর্ঘদিন ধরে পাশ্চাত্য ভোগবাদী ধারণা, কামনা ও লালসা প্রচার করে তছনচ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যতই আমরা দেশটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু ভারত এখন ওই ভোগবাদী দেশগুলোর আরেকটি 'মডেল!'

দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে নিশ্চিত আমাদের ভাবনা-চিন্তার বাইরে বিসদৃশ, পীড়াদায়ক অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। দেশকে সুস্থভাবে চালাতে গেলে, এই সকল ঘটনার সামান্য উল্লেখও ঠিক নয়! কিন্তু সংবাদপত্র ও মিডিয়া কেবল তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে দিনের পর দিন এই সব নক্কারজনক ঘটনা প্রচার করে যাচ্ছে। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই সকল ঘটনা জানছে; বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের কাছে ভিন্নবার্তা নিয়ে আসছে 'মাতৃজাতির' এই 'অবমাননা!' স্মরণাতীতকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত স্ত্রী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার আসনটি সম্বন্ধে তারাও আজ বিভ্রান্ত। মনে করছে সংবাদপত্র ও মিডিয়ার বর্ণনাই সত্য; নারীকে যেভাবে এরা দেখাচ্ছে এবং তাদের ওপর যে জঘন্য অমানবিক, নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই! এই মনোভাবই গভীর বেদনাদায়ক ও উদ্বেগজনক। নৈতিকতার যে ছবিটি আমাদের চোখে ভাসে, আজ সেটি কালিমা ও মালিন্যে ভরা। প্রশ্ন জাগে, আগামী দিনে দেশের সামাজিক পরিস্থিতি আরও কত নিম্নগামী হবে!

সরকারি স্তরে এই ভয়াবহ প্রবণতাকে রুখতে নানা ধরনের প্রয়াস দেরিতে হলেও কিছু কিছু নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যাশিত ফল এখনও পাওয়া যায়নি! কোনও অপরাধীর শাস্তি হয়নি! 'মাতৃজাতির অবমাননার' ঘটনা আজও প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে সমাজের সর্বস্তরে। কিন্তু সব বিবরণ আমরা পাচ্ছি না। মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে পড়া ইংরাজী নাটিকা 'Rising of the Moon'-এর ছদ্মবেশী বিপ্লবী চরিত্র 'The Ragged Man' পুলিশকে ধোঁকা দেবার ছলে বলেছিলেন, 'It is not everything that happens gets into the hoper', অর্থাৎ 'সব ঘটনাই কাগজে বেরোয় না।' এ-কথা সর্বাংশে সত্য। আজ তাই 'মাতৃজাতির মর্যাদা' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ও তুলে ধরতে 'শুদ্ধ দেশপ্রেমে' উদ্বুদ্ধ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে তাদের নানা কর্মসূচী নিয়ে ছোট বড় আকারে অবিলম্বে নেমে পড়তে হবে। বাধা, প্রতিকূলতা নিশ্চিত আসবে। কিন্তু সব কিছু অতিক্রম করে দেশের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও পরম্পরা আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা এই দেশ 'ভারতবর্ষ'— 'প্রাচীনভূমি'— 'পুণ্যভূমি'।

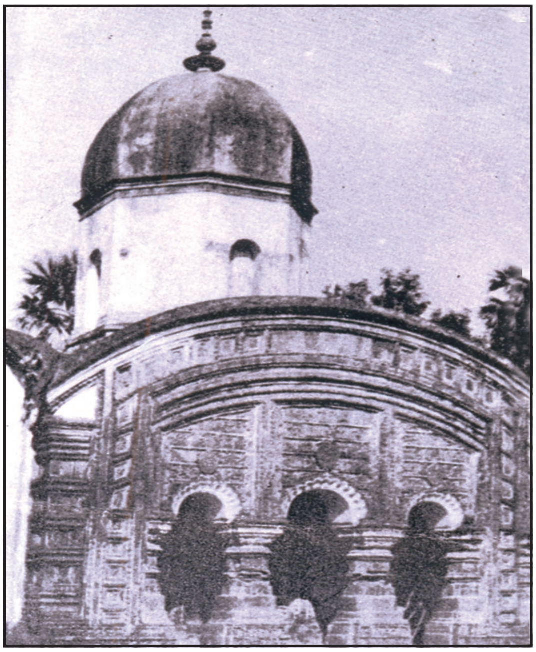

শ্রীচৈতন্য পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

(পর্ব - ১১)

রাধাকান্তপুর-দাসেদের গোপীনাথ মন্দির

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার তিনটি থানা চন্দ্রকোণা, ঘাটাল ও দাসপুরে খৃস্টীয় ষোল শতক থেকে আঠারো উনিশ শতক পর্যন্ত ইঁটের অসংখ্য মন্দির তৈরি হয়েছিল। এগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু এসব মন্দির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নির্মিত হওয়ায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মতো সুপরিচিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির স্থাপত্যশৈলী ও 'টেরাকোটা'-অলংকরণের নিরিখে এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের একটি মন্দির হলো দাসপুর থানার রাধাকান্তপুরের দাসেদের গোপীনাথের 'একরত্ন মন্দির'।

গোপীনাথের এই মন্দিরটি দাসপুর থানার একটি উল্লেখযোগ্য 'টেরাকোটা' মন্দির। এটি আঠার শতকে 'একরত্ন' বা 'একচূড়া' রীতির এক আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত। মন্দিরের বাঁকানো কার্নিশের চেয়ে ছাদ কিছুটা নীচু। 'রত্ন' বা চূড়ো আটকোণা। এটি ছাদের ঠিক মাঝখানে না বসিয়ে একটু উত্তরদিক চেপে বসানো হয়েছে। দাসপুরে একসময় যে মন্দির- মিস্ত্রীদের বসতি গড়ে উঠেছিল তাদেরই কোনও পূর্বপুরুষ এই রীতির মন্দিরকে 'আলগোছটুঙি' এই নাম দেন। 'রত্ন'টির এমনই অবস্থান যে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এটিকে ছাদের ওপর আলতোভাবে বসানো হয়েছে। একটি উচ্চ পাদপীঠের ওপর মন্দিরটি অবস্থিত।

এই মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির একটি দীর্ঘ লিপি আছে। বাংলা ১২৫১ সালে বা ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে দাস-বংশের যজ্ঞেশ্বর দাস এই মন্দির সংস্কার করান। এই লিপি থেকে তা বহু বিষয় জানা যায় এবং আরও জানা যায়, সংস্কারের ২০০ বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৪ সালে মন্দির সংস্কারক ছিলেন দাসবংশের যজ্ঞেশ্বর দাস। তাঁর পূর্বপুরুষ জনানন্দ দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামদাস তাঁর তৃতীয় ভ্রাতাকে দিয়ে বর্ধমান থেকে গোপীনাথ বিগ্রহ এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন যজ্ঞেশ্বরের প্রায় দু'শ বছর আগে অর্থাৎ আনুমানিক ১৬৫০ খৃস্টাব্দে। এই মন্দিরসংলগ্ন পুষ্করিণী ও গড় তৈরি করে বসবাস করেন। তখন ঘাটালের সন্নিকটবর্তী বরদায় জমিদার শোভা সিংহ রাজত্ব করতেন। তাঁর প্রবল প্রতাপ ছিল। তিনি সামান্য অপরাধে শ্যামদাসের মস্তক ছেদন করে নিহত করেন। শ্যামদাসের ছিন্ন মুণ্ড 'দুর্গাদুর্গা' নাম উচ্চারণ করে শোভা সিংহকে হতচকিত করে দেয়। শোভা সিংহের সময় সতের শতকের শেষ দিকে। তাই মন্দির সে সময়ের বলে অনুমান (১৬৯০-৯৫ খৃস্টাব্দ)

বহুবার সংস্কারের ফলে মন্দিরের সামনে 'টেরাকোটা'র কাজ কিছুটা পরিবর্তিত হলেও সামনের ঢাকা বারান্দার দেওয়ালের চারপাশে এবং খিলানের ওপরের তিন প্রস্থে, 'ইমারতি' থামগুলির খাঁজে খাঁজে, ভিত্তিভূমির সংলগ্ন একেবারে নীচের দেওয়ালে জীব-জন্তুর ছবি ও সামাজিক দৃশ্যপট খুবই আকর্ষণীয়।

ঝাম্পানে জমিদার বা রাজার গমন— সামনে-পেছনে লোক-লস্কর ও বাহক, হাতি ও ঘোড়ায় আসীন রাজার পার্ষদ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। এদের সকলেরই পোশাক আলখাল্লার মতো, সম্ভবত, ভ্রমণ বা শিকারের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত, এটি যুদ্ধের সাজসজ্জা নয়। এছাড়া নবাব, রাজা বা জমিদারের নৌকো ভ্রমণদৃশ্য, নদীবক্ষে রণতরী ও নৌযুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রার এক উত্তেজক দৃশ্য— সামনে পতাকাবাহী ব্যক্তি, তার পেছনে বন্দুকহাতে কয়েকজন যোদ্ধা, একটি ছোট ফলকে অঙ্কিত হয়েছে দ্বিতল প্রাসাদের কক্ষে জমিদার ও তৎপত্নীর গাত্রমর্দনরত দাসদাসী, একটি গোরুর পালের দৃশ্য। সামাজিক দৃশ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি দৃশ্য— ১. চড়ক ২. খেজুররসের জন্য খেজুর গাছে আরোহণ। দেবদেবী লীলাদৃশ্যের মধ্যে শিব-বিবাহ, রামসীতার রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি।

রাধাকান্তপুরে দাসপরিবারের গোপীনাথের মন্দির স্থাপত্য ও কারুকার্যের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। ঘাটাল-পাঁশকুড়া পাকা রাস্তায় পাঁশকুড়া বা মেচগ্রাম থেকে টানিভাটায় নেমে এখানে আসতে ৫ মিনিটেরও কম সময় লাগে।

হিন্দু পুরাণ ও মহাপুরুষের জীবনে সারমেয়

নীতিন রায়

'কুকুর হইতে সাবধান' ও রাস্তার কুকুর দেখে আমরা কুকুরকে অপাংক্তেয় মনে করি। বাস্তবে তা নয়। প্রকৃতির এই জীব বাস্তবে হিন্দু সংস্কৃতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু জীবনে গো-মাতার মাহাত্ম্যের শেষ নেই। কুকুরের মাহাত্ম্যও কম নয়। মানুষের জীবনে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হিন্দু সংস্কৃতিতে স্থান পাবে না তা কি করে হয়। ইঁদুর পেঁচা ময়ূর প্রভৃতি হিন্দু জীবনে সমাদৃত হয়ে হিন্দুকে প্রকৃতির ভারসাম্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিখিয়েছে।

কালভৈরব হচ্ছে শিবের প্রতিমূর্তি। রুদ্রমূর্তি কালভৈরবের বাহন হচ্ছে কুকুর। ভৈরবই কুকুর হয়ে জন্মান এই ধারণা সমাজে আছে। নেপালে দীপাবলীর সময় কালভৈরবের পূজা হয়। পূজার সময়ে কুকুরদের লাল টিকে দেওয়ার প্রথা চালু আছে। লালটিকে দেওয়ার পর তাদের খাবার দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রে খানোবা শিবের একরূপ। তার বাহনও কুকুর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের একত্র আবির্ভাব হয় দত্তাত্রেয় রূপে। দত্তাত্রেয়র হাতে ধরা থাকে ৪টি কুকুর। এই ৪টি কুকুরই হচ্ছে চার বেদ। বেদ মানে জ্ঞান। কুকুর জ্ঞানের প্রতীক। যমরাজার দুটো কুকুর আছে, তাদের নাম সারমেয়। তারা চারচোখে যমরাজ্যের রাস্তা-ঘাট পাহারা দেয়। ইন্দ্রের একটি কুকুর আছে তার নাম সরমা। সরমা দেবতাদের গাভীসকল পাহারা দেয়। সরমা শয়তানদের হাত থেকে গাভী মাতাকে রক্ষা করে।

রামায়ণের উত্তরাখণ্ডে (৭।২৪ সর্গ) আছে— এক ব্রাহ্মণ কুকুরকে প্রহার করে। কুকুরটি রামচন্দ্রের কাছে অভিযোগ জানায়। কুকুরটিকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মণের কি শাস্তি হওয়া উচিত? কুকুরটি বলেন, তাকে কুলপতি (উপাচার্য) করে দিন। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমার দশাপ্রাপ্ত হবে। ভগবান রামচন্দ্র হেসে উঠেন। কুকুরের আকাঙ্ক্ষিত শাস্তি ব্রাহ্মণকে দেন।

জনমেজয়ের যজ্ঞশালায় তিনি নিজে যজ্ঞ করছেন। একটি কুকুর এসে সবকিছু নিরীক্ষণ করছে। জনমেজয়ের ভ্রাতা কুকুরটিকে আঘাত করে তাড়িয়ে দিলেন। কুকুরটি রাজার মার কাছে গেল। রাজমাতা তাকে ভীষণভাবে মারলেন। সেই যজ্ঞশালায় ইন্দ্রের পোষা কুকুর সরমা এসে উপস্থিত। তিনি তার পুত্রকে বিনা দোষে মারার ব্যাখ্যা চাইলেন। ব্যর্থ জনমেজয়কে সরমা অভিশাপ দিলেন।

একলব্যের বাসস্থানের নিকট দ্রোণ তার ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। একটি কুকুরের চীৎকার শুনতে পেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন কুকুরটির মুখ তীরবিদ্ধ, শব্দ করতে পারছে না। আবার রক্তও ঝরছে না। তাই দেখে দ্রোণ তীরন্দাজের খোঁজ করলেন। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন তার মূর্তি বানিয়ে পূজা করছে এক যুবক। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এসব শিখলে কোথায়? সবই আপনার কাছে— উত্তর দিলেন যুবক। তার পরের গুরুদক্ষিণার কথা আমরা জানি।

যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে স্বর্গে রওনা হয়েছেন। সঙ্গে একটি কুকুর। পথের মধ্যে সবাই একে একে মারা গেল। যুধিষ্ঠির কুকুর সহ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলেন। মহরাজ ইন্দ্র কিছুতেই কুকুরটিকে দিব্যরথে উঠতে দেবেন না। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, 'কুকুরটি আমার সঙ্গে আছে, তাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। কুকুরবিহীন স্বর্গে আমি যেতে চাই না। আমায় ক্ষমা করবেন' 'তখন কুকুরটি ধর্মের রূপ ধারণ করলো এবং বললেন, যুধিষ্ঠির আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তুমি পরীক্ষায় পাশ করে গেলে। আমিই ধর্ম।'

শঙ্করাচার্য কাশীতে স্নান সেরে এক গলি দিয়ে আসছেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডাল ৪টি কুকুর নিয়ে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরগুলো নিয়ে সরে দাঁড়াতে বললেন চণ্ডালকে। চণ্ডাল বললো, আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও, তবেই যেতে পারবে। দেহ ও আত্মা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলো চণ্ডাল। উত্তর দিলেন শঙ্করাচার্য। রাস্তা ছেড়ে দিল চণ্ডাল। বাড়ি ফিরলেন শঙ্করাচার্য। পরে বুঝতে পারলেন চণ্ডালই স্বয়ং বিশ্বনাথ।

বামাক্ষেপা। শ্মশানেই তার বাস। তার সঙ্গী কুকুরের সংখ্যা কম নয়। লালু, ভুলুরা তার সঙ্গে লুটোপুটি করে কখনও গা ঘেঁষে একই সঙ্গে আহার করে। অনেক সময় মৃতের হারও বাবার থানে এনে ফেলে। বাবার শিষ্যরা প্রসাদ হিসাবে তা খায়। একবার তিনি কুকুরদের সঙ্গে খাচ্ছিলেন দেখে কিছু যুবক তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। খাওয়া শেষ হলে তিনি তাদের কাছে ডাকলেন। পিঠে হাত দিলেন। তারা দেখতে পেলো কুকুরগুলো মানুষ আর মানুষগুলো কুকুর। কুকুর নিয়ে নিত্য খেলা সেতো এই দেবশিশুর ব্রহ্মজ্ঞানীর নিত্যাবস্থা।

স্বামী বিবেকানন্দ পশুপাখি ভালোবাসতেন। বেলুড় মঠে হাঁস কুকুর পুষতেন। তার একটি পোষা কুকুর ছিল। কুকুরটি একটি অপকর্ম করায় তাকে নদীর ওপারে দিয়ে আসেন। কুকুরটি দুদিন পর নৌকোয় উঠে বসে। মাঝিরা তাঁকে নামাতে এলে সে চায় না নামতে, তেড়ে আসে। দাঁত বের করে কামড়াতে চায়। মাঝিরা বুঝলো ও ওপারে যেতে আগ্রহী। নৌকো ছাড়া মাত্র শান্ত হলো। দুদিন লুকিয়ে বেড়ালো। স্বামীজীর কাছে গেল না। এ দেখে স্বামীজী বললেন একে আর দূরে রাখা যাবে না। যত অপরাধই করুক এ এখানেই থাকবে। কুকুরটি মারা গেলে নদীতে ফেলে আসা হয়। নদীর জলে আবার মৃতদেহ ফেরত আসে। তারপর সবার অনুমতি নিয়ে এক সন্ন্যাসী তাকে গঙ্গার পাড়ে সমাধি দেন।

স্মরণ অনুষ্ঠানে গাওয়া একটি গান

স্মরণ অনুষ্ঠানে অনেকে নানান কথা বলবেন। প্রয়াত মানুষটি নামীদামী ছিলেন না। তবে অবশ্যই প্রকৃত মানুষদের একজন। অধিকাংশ মনুষ্যসন্তান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড়ো হয়ে যায়। মানুষ হতে পারে না সকলে। কারণ সেটা বড় কঠিন ব্যাপার। তিনি শিক্ষকতা করেছেন পঞ্চাশ বছরের বেশি। স্কুলের চাকরিতে ঢুকেছিলেন একুশ বছর বয়সে। পঁয়ষট্টি বছরে অবসর নেওয়ার পর কিছু গরীব ছেলেমেয়েকে পড়াতেন। কোনও দক্ষিণা নিতেন না। তাছাড়া কয়েক জনের খাতাপত্র কিনেও দিতেন। বই জোগাড় করে দিতেন। উৎসাহ দিয়ে বলতেন, এগিয়ে চলো। মন দিয়ে পড়ো। অনেককে খাবারও দিতেন। বলতেন, 'খেয়েনে বাবারা। না খেলে পড়বি কি করে?' কখনও কোনও ছেলেকে বকেননি, মারধোরও নয়। মন দিয়ে শেখাতেন, বোঝাতেন বারবার। অধৈর্য হোতেন না। অন্যদের বলতেন, 'ছোটদের শেখার আগ্রহ জাগাতে হবে নানারকম বই পড়ে।' নিজে প্রচুর পড়তেন। রুলটানা মোটা খাতায় লিখতেন। বইপত্র কিনে ছেলেদের দেওয়ার অভ্যেসও তাঁর ছিল। অবসর নেওয়ার পরও স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। প্রাক্তন ছাত্রেরা অনেকেই নামী এবং ধনবান। তাঁরা মাঝেমধ্যে প্রিয় স্যারকে কিছু-না-কিছু উপহার দিতে চেয়েছে। বই ছাড়া কোনও জিনিসই নয়। বলতেন, 'একা মানুষ। আমার চাহিদা কম। যা আছে তা যথেষ্ট। বইটই পেলে ভালো লাগে।' মৃত্যুর আগে ঠিক করে রেখেছিলেন কোথায় কি দেওয়া হবে। আত্মীয়স্বজন মাঝে মাঝে আসত, খবর রাখত নিয়মিত। শিক্ষকমশাই চাইতেন না, তাঁর জন্যে কারও অসুবিধে হোক। তবে কেউ এলে খুব খুশি হতেন। তার সব বই দেওয়া হয়েছে একটা লাইব্রেরিতে। টাকা পয়সা জনকল্যাণ সংস্থাকে দিয়েছেন কিছু। বাকি নিকট আত্মীয়দের। চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে স্মরণ অনুষ্ঠান হলে রবীন্দ্রনাথের লেখা গান যেন থাকে। এক নাতি গান শুরু করল খালি গলায়। স্পষ্ট উচ্চারণ, সুরতাল লয় বোধ যথেষ্ট। গানটা গাওয়ার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ভালো লাগল দেবজিতের। বাবার ছোটকাকার স্মরণ অনুষ্ঠান। তার ছোট-দাদু। গান গাইছিল তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র। শুভব্রত। গানটা অনেকবার শোনা। ওই অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগল। গান নির্বাচন খুব ভেবেচিন্তে করা— এটা বোঝা যাচ্ছিল।

শুভব্রত গাইছিল, 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়/কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রায় করে হায় হায়।' দেবজিৎ সোজা হয়ে বসে শুনছিল। প্রতিটি শব্দ গেঁথে যাচ্ছিল মনের গভীরে। শুভব্রত গনের পরের অংশে গেল, 'নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,/ একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়।' গানের প্রথম অংশে আবার ফেরা, 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর...।' দেবজিৎ মনে মনে গাইছিল। একবার তাকাল আশপাশে, সকলেই শুনছে মন দিয়ে। শুভব্রত গাইল, 'যাহা যায় আর যাহা-কিছু থাকে সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে/ তবে নাহি ক্ষয় সবই জেগে রয় তব মহামহিমায়।' দেবজিতের মনে হচ্ছিল প্রতিটি শব্দ অনেক ভেবে সাজানো। বিকল্প অন্য কোনও শব্দ বললে চলবে না। গানের শেষ অংশ 'তোমাতে রয়েছে কত শশীভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু/ আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে নাকি তব পায়।' এতো সমবেত বা একক শ্রদ্ধা নিবেদন। বিশেষ কারও জন্যে লেখা নয়। অথচ দেবজিতের কেবলই মনে হচ্ছিল ওই অনুষ্ঠানের জন্যেই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছোট-দাদুর ছবির দিকে তাকাল। প্রয়াত মানুষটির ছবিতে প্রশান্তভাব। যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনের পর মনে হচ্ছিল যাঁকে স্মরণ করা তিনিও শুনেছেন।

বাড়ি ফেরার পর আস্তে আস্তে গানটা গাইল স্মৃতি থেকে। তারপর 'গীতবিতান' দেখল, না, কোথাও ভুল হয়নি। একটু বইপত্র ঘেঁটে দেখল। গানটা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন একশো বারো বছর আগে। ১৩০৭ সালে। এখন চলছে ১৪১৯। তখন তাঁর বয়স ৩৯। লেখা চলছে। নোবেল পুরস্কার পেতে অনেক দেরি। পারিবারিক জীবনে অনেক দুঃখ আঘাত ক্রমাগত আসছে। সব সইবার আর বহনের শক্তি তাঁর বরাবরই ছিল। এ গান তো তাঁরই নিবেদন, ভিতরের এক সত্তাকে মনে করিয়ে দেওয়া বার বার, 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।' দেবজিত নিজের গানের সংকলনে খুঁজে পেল ওই গানটা। এক নামী গায়ক গেয়েছেন। শুনল। ঠিকই আছে। গানের সঙ্গে এসরাজ তানপুরা আরও কিছু বেজেছে। তবে বাজনা কখনও গানের কথাকে অতিক্রম করে যায়নি। শুভব্রত খালি গলায় সকলের সামনে যেভাবে গেয়েছে তা ভুলতে পারছিল না।

একটু বাদে শুনতে পেল বাড়ির অন্য ঘরে শুভব্রতর গাওয়া গানটা বাজছে। দেবজিৎ বুঝতে পারল, তার ভাই অরিজিত গানটা ধরে নিয়েছে টেপ রেকর্ডারে। মন দিয়ে শুনল। তারপর শুভব্রতর গলায় গানটা আবার শোনার জন্যে এলো একতলার ঘরে। অরিজিতকে বলল, 'গানটা আরেকবার শোনাও তো।' শুভব্রত গাইছিল, অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়—।' অরিজিতের ছেলে অনন্যর বয়স সাত বছর। সে বলল, 'জেঠু তোমার ভালো লেগেছে তাই তো? আমি গাইবো, শুনবে?' দেবজিৎ বলল, নিশ্চয়ই। অনন্য শুরু করল, 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।' ওই গান অনন্যর গাওয়ার কথা নয়। গানটা তার মনও ছুঁতে পেরেছে। দেবজিৎ সেটাই ভাবছিল বার বার।

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

বিজ্ঞানমেলার সাতদিন

ছোটোদের নিয়ে প্রতিবছর বিজ্ঞান প্রদর্শনী করে রামকৃষ্ণ। পুরো নাম রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সাতদিন ধরে রাস্তার যে অংশটা চওড়া আর লোক চলাচল কম সেই জায়গাটা বেছে নেয়। বেশ কয়েকবছর ধরে শীতের সময় হয়। জানুয়ারির প্রথম দিকে। নাম দিয়েছে 'বিজ্ঞান মেলা'। প্রথমদিকে দলে লোকজন ছিল খুব কম। তবে একটুও টান পড়েনি উৎসাহে। রামকৃষ্ণ নিজে খুব খেটেছে। সব ভাবনা তার। কাদের দিয়ে কাজ হতে পারে— সেটা বুঝে ডাক

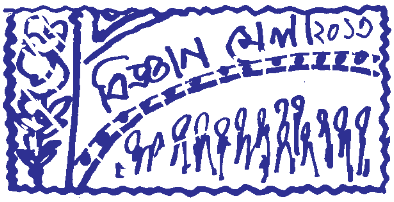

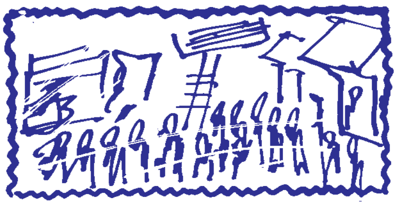

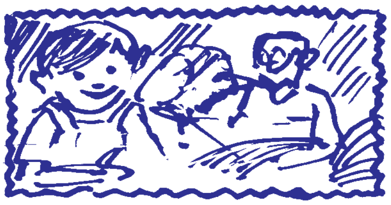

দিয়েছিল কমবয়সী আট দশজন ছেলেকে। কাজ করানোর ক্ষমতা সকলের থাকে না। মাতব্বরি করতে পারে অনেকে, কর্তাগিরি দেখানোয় পটু। কাজের বেলায় সব কৌশল হয়ে যায় ফুটো বালতিতে ভরা জল। রামকৃষ্ণ দশজনকে নিয়ে দল গড়ে ফেলল। কি কি হবে ঠিক করে ফেলল আলোচনার পর। একেকজন ভাগ নিল এক-একদিকের। আশপাশের কয়েকটা স্কুলের সঙ্গেও আলোচনা করে নিল রামকৃষ্ণরা। স্কুলগুলো রাজি। মডেল তৈরি করে তারা আসবে। বিকেল তিনটে থেকে মেলা শুরু হবে। চলবে রাত আটটা পর্যন্ত। কয়েকটা বিজ্ঞান ক্লাবও যোগ দিতে রাজি— এটা জেনে উৎসাহ বেড়ে গেল রামকৃষ্ণদের। প্রাথমিক পর্বে টাকা পয়সা জোগাড় করা আর সবকিছু ঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনাটা মাথায় রেখেছে রামকৃষ্ণ। সে ঠান্ডা মাথায় সব কাজ সামলাতে পারে। আকর্ষণীয় রূপ দেওয়ার জন্যে অনেকের সঙ্গে কথা বলল। কেউ নিরুৎসাহ করেনি। সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়াও যে কোনও উদ্যোগে বড় ব্যাপার। মেলা হবে খোলামেলা। কোনও প্রবেশ দক্ষিণা থাকবে না। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সঙ্গে থাকবে আলোচনা। বইপত্রের প্রদর্শনী। একটা বড় পোস্টার তৈরি হলো রবীন্দ্রনাথের লেখা দিয়ে। একটাই কথা। কিন্তু সরাসরি। মন ছুঁয়ে যায় সবসময় : 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।' রাস্তা একেবারে ঝকঝকে সাফ করে দিল কলকাতা পুরসভা। অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। রামকৃষ্ণ বলল, 'সব টাকা পয়সার হিসেব আমরা সবাইকে জানাবো। একটা স্মারক পুস্তিকা বেরোবে। অনেকে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিতে রাজি।' বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার জন্যে এক বিজ্ঞানীকে আনা ঠিক হলো।

রামকৃষ্ণকে নিয়ে এসেছিল হোতুর কাছে অর্জুন। প্রথম দেখেই আর কথাবার্তা শুনে বুঝল রামকৃষ্ণ কম কথা আর বেশি কাজের মানুষ। হাসিখুশি। সব বিষয়ে ওস্তাদি মার্কা কথাবার্তা যারা বলে তাদের একেবারেই হোতু পছন্দ করে না। রামকৃষ্ণকে জিগগেস করল, 'আমি তোমাদের জন্যে কি কি করতে পারি?' রামকৃষ্ণ বলল, 'যা আপনি চাইবেন, তাই-ই আমাদের দিতে পারেন। আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। পরামর্শ দেবেন।' হোতু বলল, 'আমি অবশ্যই থাকবো। তোমরা এগিয়ে চলো। আমাকে নিতে পারো তোমাদের কর্মীদলে। তোমরা যা যা ভার দেবে সব করার চেষ্টা থাকবেই। তোমরা যে-কোন সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। অর্জুনকে বললেই হবে। আমি আছি তোমাদের পাশে, তবে বয়স তো হয়েছে, বেশি দৌড়ঝাঁপের কাজ দেবে না আশা করি।' রামকৃষ্ণ বলল, 'আপনি সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট।'

বিজ্ঞানমেলার কথা প্রচার চলতে থাকল নানাদিকে। হোতু প্রতিদিনই একটু সময় বের করে নিলো 'বিজ্ঞান মেলা'র কাজে। নিয়ম মেনে সব কাজ করার অভ্যেস তার। চিকলি শিটুকে কিছু ভার দিল। কোতুকে বলল, 'অনেক কাজ করতে হবে না রেগে, মাথা ঠান্ডা রেখে। ছোটোদের নিয়ে কাজ হবে। তোমাকে যা যা বলবো তাই করবে। না পারলে জানাবে।'

মেলা উদ্বোধনের দিন হোতু হাজির রইল। রামকৃষ্ণকে বলে দিয়েছিল, 'আমাকে কখনও কিছু বলতে বলবে না। মঞ্চে তুলবে না।'

মেলা শুরুর পর হোতু ঘুরে ঘুরে মন দিয়ে দেখল। তারপর এক ফাঁকে চিকলি শিটু কোতুকে নিয়ে মেলায় অংশ নেওয়া স্কুলের ছেলেমেয়েদের খাবারের প্যাকেট দিল। পেট ভরাবার মতো ভালো খাবার। খাবারের প্যাকেট ছিল অন্যদের জন্যেও।

মেলার শেষদিনে রামকৃষ্ণ বলল, 'হোতুদা, আপনার কদিন খুব পরিশ্রম হচ্ছে।'

হোতু বলল, 'শুধু খাটুনিই দেখলে, মন কতটা ভরল তা তো জিগগেস করলে না?'

রামকৃষ্ণ হাসল। অবশ্যই প্রাণখুলে। হোতুও।

কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

টুনটুনির বই আর উপেন্দ্রকিশোর

টুনটুনির বই-এর গল্প অনেকবার শুনেছে দেবাদৃতা ঠাকুমার কাছে। তারপর একটু বড় হয়ে নিজে পড়েছে। নিজে পড়ার মজাটা পেয়েছে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে। বাড়িতে অনেক রকমভাবে তৈরি টুনটুনির বই রয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কত চমৎকার লিখেছিলেন। ছবিও তাঁর আঁকা। বইটা বাড়ির সকলের পড়া। একশো বছর আগে প্রথম বেরোয়। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন ছোটোদের প্রিয় লেখক। 'সন্দেশ' পত্রিকা বেরোতে শুরু করে তাঁরই উদ্যোগে। তাঁর ছেলে সুকুমার রায়। ছোটোবড়ো সকলের প্রিয় আরেক লেখক। সুকুমার লিখতেন, ছবি আঁকতেন। ফোটোগ্রাফি চর্চা করতেন। দারুণ মজার কত কী লিখতেন। নিজের প্রথম বই প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। যখন প্রকাশের কাজ চলছিল তখনই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর জীবনে পূর্ণচ্ছেদ নেমে আসে। জীবন অবসানের সময় তাঁর বয়েস হয়েছিল ছত্রিশ বছর। পুত্র সত্যজিতের বয়স তখন আড়াই বছর। সত্যজিৎ তাঁর ঠাকুর্দার লেখা 'গুপি-গাইন-বাঘা-বাইন' কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেন। 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন উপেন্দ্রকিশোর। সেই পত্রিকা পরবর্তী সময়ে সম্পাদনা করেছেন সুকুমার-সত্যজিৎ। এখন করছেন সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. 'দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই জীবনের উদ্দেশ্য করা দরকার। তার সঙ্গে চাই সমর্পণ, কঠোর পরিশ্রম, সংকল্প ও আগ্রহ।' একথা কে বলেছেন? তাঁর পরিচয় কি?

২. 'আমি কে? আমি সামান্য এক প্রধানমন্ত্রী এই সংগীত- সম্রাজ্ঞীর সামনে?' কে একথা বলেছিলেন? সংগীত-সম্রাজ্ঞী কে?

৩. বিশ্বদরবারে ভারতীয় সংগীতের দূত বলা হয় কাকে? তাঁর জন্ম মৃত্যু কবে?

৪. সিকিম-এর অবস্থান কোথায়? আশপাশে কি? 'সিকিম' নামে তথ্যচিত্র কে তৈরি করেন?

৫. 'সি বি আই'-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : ১. এ পি জে আবদুল কালাম। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিজ্ঞানী। ২. জওহরলাল নেহরু। এস. এস. শুভলক্ষ্মী। ৩. পণ্ডিত রবিশঙ্কর। ১৯২০-২০১২। ৪. হিমালয়ের পূর্ব অংশে। তিব্বত, ভূটান, নেপাল আর উত্তরবঙ্গের সমতল অঞ্চল। সত্যজিৎ রায়। ৫. সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন।

ছবিতে তফাত খোঁজা

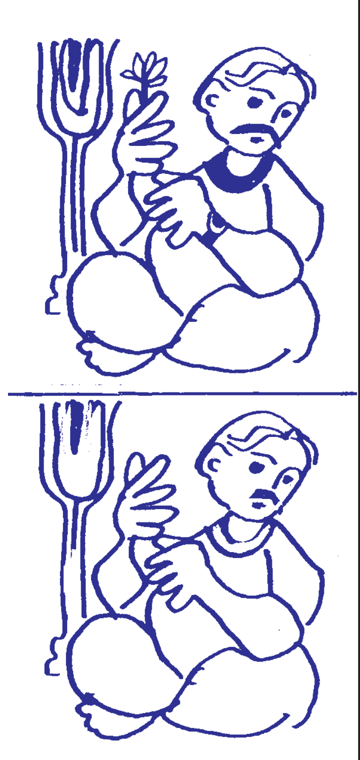

উ ল টো পা ল টা

সাগরবাবু মাঝে মাঝেই জামা পরার সময় দেখেন বোতাম নেই। আগে নিজে পরিয়ে নিতেন। এখন চোখে কম দেখেন। ছুঁচে সুতো পরানো সহজ ব্যাপার নয়। বোতাম লাগানোও কঠিন কর্ম। অনেকরকম ভুল হতে পারে। হয়ত অনেক ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও স্ত্রী-ই ভরসা। অনেকসময়েই লাগিয়ে দেন ঠিক রঙের বোতাম জোগাড় করে। সেদিন বেরোবার সময় সাগর দেখলেন জামায় বোতাম নেই। গৃহিণীকে বললেন বোতাম লাগিয়ে দিতে। একটুবাদে সাগর জিগগেস করলেন, 'বোতাম লাগিয়ে দিয়েছ?' স্ত্রী বললেন, 'বোতাম ঘরে নেই।' সাগর জিগগেস করলেন, 'তাহলে কি হবে?' গৃহিণী বললেন, 'ঘরে বোতাম না থাকলে একটা উপায়ই থাকে। তাই-ই করেছি। বোতামের ঘর বন্ধ করে দিয়েছি।' সাগরবাবু চুপ।

।।২।।

একটা দলের মিছিল চলেছে তেড়েফুঁড়ে।

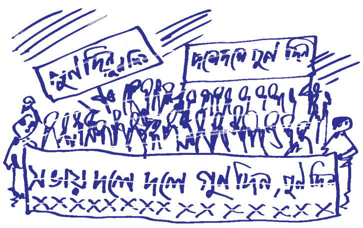

গলার শিরা ফুলিয়ে হাত ছোঁড়া পেশাদার রাজনীতিওয়ালারা রাস্তা দখল করে এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটাড়ি সব বন্ধ। লোকে চটে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না। বাগবাজারের ব্যানার-লেখক দাশু দাস একটু চমকে গিয়ে স্লোগান শুনল : 'বুধবারের সভায় যোগ দিন, যোগ দিন।' সে পাশে দাঁড়ানো বিল্টুকে বলল, 'দ্যাখ আমি লিখেছি— বুধবারের সভায় গুণ দিন, গুণ দিন।' বিল্টু বলল, 'রাজনীতিওয়ালারা যোগ আর গুণ দুটোই সমান চোখে দেখে। শুধু বিয়োগ চায় না। ভাগও নয়।'

রামগরুড় সংকলিত

মহিলাদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও প্রাপ্তি

প্রীতি বসু

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৫২ সালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করে। পরিকল্পিত উন্নয়নগুলিকে সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের কল্যাণের দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনাতে পরিবারে মহিলাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, সেই ভূমিকা পালনের সুযোগ মহিলাদের দেওয়া, গোষ্ঠীতে মহিলাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা এবং মহিলাদের কল্যাণে পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল। পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে মহিলাদের কেন্দ্রে রেখে যে কর্মসূচীগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হলো— (১) গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মসূচী (২) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা (৩) সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দিতে পরিকাঠামো নির্মাণ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় মহিলাদের শিক্ষা, প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশুদের বিকল্প খাদ্য, নার্সিং প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হয়।

পরিকল্পকদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে মূলত দেখা যাচ্ছিল যে তাঁরা সামাজিক পরিষেবা বন্টনের ক্ষেত্রে মহিলাদের স্থান নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু সম্পদ বরাদ্দে এই ক্ষেত্রকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। তবে সাতের দশকেরই মাঝামাঝি তিনটি ঘটনা, উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার পুরোভাগে নিয়ে এল। এগুলি হলো— ভারতে মহিলাদের অবস্থা নিয়ে ১৯৭৫ সালে Committee on the status of Women in India (CSWI) এর রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৭৫ সালেই 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' পালন এবং মহিলাদের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। আগে মহিলাদের জন্য পৃথক কোনও উন্নয়ন প্রকল্প ভাবার চল ছিল না। পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই উপকারে আসে— এমনটা ভেবেই প্রকল্পগুলির রূপরেখা তৈরি হোত।

সাতের দশকের শেষে খসড়া পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের জন্য নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত হলো। ১৯৮০-৮৫-ই এই পরিকল্পনাটিতেই প্রথম নারীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি পৃথক্ অধ্যায়ের সূচনা হলো। পরিবারকে উন্নয়নের একক ধরে মহিলা ও শিশুদের শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হলো। এগুলির ভিত্তিতেই

অঙ্গনা

দারিদ্র্য-দূরীকরণ নীতি অবলম্বন করা হলো। এই নীতির আওতায় সরকার যে কর্মসূচীগুলো হাতে নিল তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প।

মহিলাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্র অনেক পুরনো আইন সংশোধনের মাধ্যমে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছেন। যেমন— শিশু বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিবর্তে আরও কার্যকর ও সার্বিক শিশু বিবাহ নিষেধ আইন আনা হয়েছে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যা ভ্রূণহত্যার পূর্বেকার আইনকে আরও শক্তিশালী ও নিশ্ছিদ্র করার জন্য সংশোধন করা হয়েছে।

মহিলাদের অধিকারগুলি যাতে ফলপ্রসূ হয় তার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে মহিলা সেল গঠিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবিকক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলাদের অধিকারগুলি যথাযথভাবে রক্ষিত হয় না।

শহর ও গ্রামের সমস্ত মহিলাদের সম্পর্কেই বলা যায় যে তাঁদের কাজ বরাবরই উপেক্ষিত। তবে এ বিষয়ে গ্রামের মহিলাদের উপেক্ষাটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিবারে নীরবে শ্রম দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমসংক্রান্ত নথিপত্রে তাঁদের উল্লেখ করা হয় না। বিনামূল্যে খাদ্য ও পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য হিসেবেও তাঁরা বিবেচিত হন না, কারণ তারা কোনও শিল্পে বেতনের বিনিময়ে নিযুক্ত হন না। নারী উন্নয়ন কর্মসূচীগুলিকে অগ্রণী কর্মসূচীর মর্যাদা দেওয়া হয় না। ফলে কর্মসূচীগুলি সামান্য কয়েকটি ব্লক বা জেলায় রূপায়িত হয়, সার্বিক ভাবে প্রচারিত হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের জন্য পুষ্টি কর্মসূচী প্রভৃতির কথা বলা যায়। ফলে এগুলির বিষয়ে জনসচেতনাও বাড়ে না। মোটামুটিভাবে বলা যায়— রাষ্ট্র মহিলাদের সুবিধার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করলেও, মহিলাদের মূল্যায়ন ঠিকভাবে হয় না, অবমূল্যায়নই হয়। সঠিক মূল্যায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা অনেকই আছে, তবে যেটি বিশেষভাবে দৃষ্টিতে আসে সেটি হচ্ছে— শিকড়গড়া পিতৃতান্ত্রিকতা অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী। কাজেই আত্মসমীক্ষার বড় প্রয়োজন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলারা নিজেদের পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে প্রতিপন্ন করছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা পুরুষের থেকে ভাল ফল করছেন। পরিবারে তথা সমগ্র দেশে তাঁদের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। ঘরে-বাইরে তাঁরা একাধিক দায়িত্ব পালন করেন। কাঁধে হাজারো দায়িত্ব তুলে নেন। তাই তাঁদের দুর্বলতর শ্রেণী হিসেবে না দেখে তাঁদের সাক্ষীকে গুরুত্ব দিয়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে দেখা দরকার। পরিবারের সদস্য হিসেবে নয়, বিভিন্ন কর্মসূচীতে তাঁদের ব্যক্তি হিসেবে দেখা দরকার, তাঁদের সম্ভাবনার বিকাশে সার্বিকভাবে সাহায্য করা দরকার।

আমায় বদলি করবেন না প্লিজ ঘরে বউ-বাচ্চা আছে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ম্যাডাম,

দুটি ঘটনার উল্লেখ করব। দুটিই আপনার আমলে। আপনি হয়তো মনে করবেন এতে আবার মিল কোথায়? কিন্তু আমি খুব মিল দেখতে পাচ্ছি। আপনার প্রশাসন এবং তার নেত্রী হিসেবে আপনার পারফরমেন্স দুটো ঘটনাতেই একেবারে পরিষ্কার।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। স্টেডিয়াম ফুটছে। দু'পক্ষের লাখ খানেক দর্শক উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে খেলা দেখছে। পুলিশও তন্ময় হয়ে দেখছে কার গোলে বল ঢোকে। হঠাৎ উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে পড়ল। মাঠে এসে পড়ছে ইট, বোতল। পুলিশের কাজ ছিল দর্শকাসনের দিকে তাকিয়ে থাকা কিন্তু তাঁরাও খেলা দেখছিলেন। মোহনবাগান গ্যালারি থেকে আসা ইটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মোহনবাগানেরই খেলোয়াড় রহিম নবি। তাঁকেই যে তাক করে মারা হয়নি সেটা পরিষ্কার ছিল। কিন্তু লেগে গেছে। ইটের তো আর চোখ নেই। ইট জার্সির রঙও চেনে না।

এদিনও খেলা দেখছিল পুলিশ। হরিমোহন ঘোষ কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে উত্তপ্ত গোটা গার্ডেনরিচ এলাকা। বরাবরই উত্তপ্ত কলকাতার এই প্রান্তিক এলাকা। কলেজ ভোট নিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উত্তেজনা এই রাজ্যে নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেদিন সকাল থেকে ওই কলেজের গেটের দুপাশে যারা পেশি ফোলাচ্ছিলেন তারা কলেজের কেউ নয়। সকলেই রাজনীতিক। সকলেই রাজনীতির আশ্রিত। সেন্টার লাইনের দুপাশে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে যেন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। পুলিশও অপেক্ষায় আছে কখনও খেলা শুরু হয়। কিন্তু এই খেলার আবার গোটাটাই ফাউল। ফাউল না করলেই বরং রেফারির বাঁশি বাজার কথা। শুরু হল খেলা। এই পক্ষ ওই পক্ষকে একটা বোমা বাড়িয়ে দিতেই ওরা চার রাউন্ড গুলি পাঠিয়ে দিল এই দিকে। হঠাৎ একটা গুলি এস আই তাপস চৌধুরীর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। কী করে লাগল? উনি তো ওই খেলার প্লেয়ার ছিলেন না? কী আর করা যাবে? গুলির তো আর চোখ নেই। গুলি পুলিশের পোশাকও চেনে না।

ফুটবল মাঠে সেদিন ইটটা মোহনবাগানের রহিম নবির মাথায় না লেগে ইস্টবেঙ্গলের কোনও প্লেয়ারের মাথায় বা অন্য কোথাও লেগে যেত যদি কী হত তবে? এমনিতেই ফুটতে থাকা স্টেডিয়ামে কতটা আগুন ছড়াত? সেই আগুন কি শুধু স্টেডিয়াম বা কলকাতাতেই থাকত? না থাকত না। দেশভাগের এত বছর পরও এ রাজ্যে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান যে পৃথক দুটি সম্প্রদায় তা ভুলে গেলে চলবে না। খেলার ফলাফল নিয়েই অনেক লড়াই চলে সারাটা বছর। কিন্তু খেলার বাইরের সেই আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিয়ে কী বিপদটাই না হতে পারত!

গার্ডেনরিচের গুলিটা এবার ধরা যাক কোনও রাজনীতিক কিংবা তাদের পরম আশ্রয়ে থাকা কোনও সমাজসেবকের গায়ে লেগে গেল। কী হত তবে? সেই দাঙ্গা কোথায় যেতে পারত? কতগুলো বাড়িতে আগুন লাগতে পারত? কতগুলো পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসত? আর দুষ্কৃতীদের বদলার গোষ্ঠীদাঙ্গা কতদিন ধরে চলত? কত লাশ পড়ত?

যাক, এ যাত্রায় তবু একা রহিম নবি আঘাত সয়েছেন। একা ওই পুলিশকর্মী প্রাণ দিয়েছেন। সত্যিই ভগবান রক্ষা করেছেন রাজ্যকে। কিন্তু আর কতকাল রক্ষা করবেন কে জানে?

ম্যাডাম, আপনি জানতে চাইতে পারেন একটা ফুটবল খেলার সঙ্গে এই গোলমালটাকে মেলানোর কী আছে? আমি বলি, কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সামাল দেওয়ার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচে শান্তি বজায় রাখা। দু'ক্ষেত্রেই উত্তেজনার পারদ কতটা চড়া ছিল তাও অজানা ছিল না আপনার পুলিশ বাহিনীর। আর সেদিনের ঘটনা যে গোলা-গুলি পূর্ণ হবে সেটার তো হাতে গরম সতর্কতা ছিল। একে গার্ডেনরিচ এলাকা। যা কলকাতার আর পাঁচটা এলাকার তুলনায় রীতিমতো বারুদের স্তূপ। অন্যদিকে আপনারদেরই দলের এক অবাধ্য (!) কাউন্সিলারের অবাধ্য (!) পুত্র বন্ধুদের নিয়ে বোমা বানাতে গিয়ে জখম হন (পরে মৃত্যুও হয়েছে)। এসব জেনেও, ঘটনার দিন রণসজ্জায় সজ্জিত কলেজ চত্বর দেখেও, আপনার পুলিশ কর্তারা বুঝতে পারলেন না গোলমাল কত বড় হতে পারে।

যাক মুখ্যমন্ত্রী দিদিভাই, আপনি ওই পচনন্দাকে সরিয়ে দিয়ে মন্দ করেননি। যে পুলিশ কমিশনার নিজের আসল দায়িত্ব ভুলে আপনার বাড়ির দীপাবলীর আলো সাজাতে ব্যস্ত থাকেন তাঁকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। তবে লোকে বলছে সেটাও ছিল আপনার ইচ্ছায়। আবার এটাও মানে দুষ্কৃতীদের ধরতে গড়িমসি করাটাও ছিল আপনারই ইচ্ছায়। তবে সে, যে যাই বলুক পুলিশগুলো যে বাম আমলের এটাও তো ভুললে চলবে না। ওদের বদলি করে শাস্তি দেওয়াই উচিত। তাছাড়া মন্ত্রী বাঁচাতে সান্ত্রীদের সাজা পেতেই হয়। তবে আপনার স্নেহের ফিরহাদ ভাইকে শেষ পর্যন্ত আড়ালে রাখতে পারবেন তো? কিন্তু দিদি রাখতেই হবে। ফিরহাদ মানে কিন্তু অনেকগুলো সংখ্যালঘু ভোট!

জানি দিদি, সবদিক সামলাতে গিয়ে ইদানীং আপনি মাথার ঠিক রাখতে পারছেন না। তাই এই চিঠি পড়ে আপনি বলতেই পারেন, 'থাবড়ে গাল লাল করে দেব', 'এদের চাবকানো উচিত'। শুনে মৌনতা দিয়ে সম্মতি জানাব। কিন্তু দোহাই দিদি, বদলি করে দেবেন না। বউ বাচ্চা আছে। (এটা পুলিশ, আমলা সহ আপনার এবং আপনার দলের নেতা মন্ত্রীদের ক্ষমতার আওতায় থাকা সক্কলের মনের কথা।)

—সুন্দর মৌলিক

অতিথি কলম

বর্বর পাকিস্তানকে নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছি

জয় দুবাসী

আমি যদি সেনাধ্যক্ষ অথবা ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতাম, সেনাদের নির্দেশ দিতাম 'এগিয়ে যাও'। প্রথমে বলতাম লাহোর দখল কর আর টুকরো টুকরো করে দাও লাহোরকে, তারপর ইসলামাবাদ গিয়ে জ্বালিয়ে দাও রাষ্ট্রপতিভবন এবং পঙ্গু করে দাও আধা অর্ধশিক্ষিত জেনারেলদের আর এয়ার মার্শালদের। আর সবশেষে কাশ্মীরে ঢুকে সেখানে যত পাকসেনা নজরে পড়ে তাদের মাথা নিয়ে দিল্লী ফিরে এসো।

অবশ্যই আমি সেনাধ্যক্ষ নই— কিন্তু ঘটনা হলো কোথায় আমাদের সেনাপতি? কোথায় আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী— নাহ্, তাঁদের দ্বারা এসব হবে না। কিন্তু আমার লক্ষ কোটি দেশবাসীর যেমনটা মনে হচ্ছে তেমন ভাবেই আমার উষ্মা ব্যক্ত করছি হতাশায়। মনমোহন সিং কোথায়? পাকিস্তান নামে আমাদের এক বর্বর প্রতিবেশী যেভাবে অকল্পনীয় বর্বরোচিত ব্যবহার করেছে তা যথেষ্ট উস্কানিমূলক আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী চুপচাপ যেন মুখে কুলুপ এঁটেছেন। শুধু সরকারকে দোষ-ই দিই কেন, সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে তা আমাদের সেনাই হোক কিংবা সেনাপতি। এটা নিছকই লজ্জাজনক।

অত্যাচারের পরের দিনই আমার মনে হয়েছে আমরা যেন মধ্যযুগে বাস করছি। পাক হাইকমিশনারকে দেখা গেল দিল্লীর বিদেশ দপ্তরে। বলা হচ্ছে তাঁকে নাকি ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁর মুখে চওড়া হাসি। সরকারি দ্বারপ্রান্তে দ্বাররক্ষী তাঁকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে তিনি এ. কে. অ্যান্টনির জন্মদিবসে আহূত একজন। আরেকটা চুক্তি স্বাক্ষর করতে অথবা কেরলে গিয়েছেন নববর্ষ পালন করতে।

আমাদের দেশের মধ্যে থেকে পাক-বদমাশদের প্রশংসা করে কাশ্মীরের নৃশংসতার সংবাদ ছবিসহ ছাপিয়ে সম্পাদকীয়তে উপদেশ দিয়েছে আমরা যেন উত্তেজিত না হই। যে দেশের সরকারি নেতৃত্ব বেহায়া, সেখানে এদের থেকে আমরা আর কী আশা করতে পারি?

আমাদের নির্লজ্জ সরকারের রয়েছে এক নির্লজ্জ মন্ত্রিসভা। তারা জানেই না দেশে কী ঘটছে অথবা জানলেও সেই সব বিষয়ে থোড়াই কেয়ার করে। এমনকী আমাদের মিডিয়ারও কোনও হেলদোল নেই। এমন এক তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্র সম্ভবতঃ হিন্দুবিদ্বেষী এবং সুতরাং স্বভাবতই ভারতবিদ্বেষী। আমাদের দেশের মধ্যে থেকে পাক-বদমাশদের প্রশংসা করে কাশ্মীরের নৃশংসতার সংবাদ ছবিসহ ছাপিয়ে সম্পাদকীয়তে উপদেশ দিয়েছে আমরা যেন উত্তেজিত না হই। যে দেশের সরকারি নেতৃত্ব বেহায়া, সেখানে এদের থেকে আমরা আর কী আশা করতে পারি?

আর মজার ব্যাপার এইসব ঘটনার মধ্যে পাকিস্তানী ক্রিকেট দল এদেশে এসেছে। যখন পাক সেনারা আমাদের সেনাদের হত্যা করছে তখন বধ্যভূমির অনেক দূরে পাকিস্তানীরা আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে। আমাদের কারুর-ই এমন সাহস হলো না ম্যাচ বাতিল করে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। আমাদের সেকুলারবাদীদের যুক্তি হলো পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে পাক খুনেদের এক করে দেখলে চলবে না। দুই ঘটনা গুলিয়ে ফেললে হবে না— ইত্যাদি। এসব বাজে কথা। এটা একটা দেশের ব্যাপার এবং কে কোন কর্ম করল সেটা বড় কথা। ঘটনাগুলি মর্মান্তিক। আমরা এদিকে ক্রিকেট খেলছি আর সীমান্তে অস্ত্র শাণাচ্ছে আমাদের জওয়ানদের মাথা কাটার জন্য।

এর আগে বহুবার এই কলমে আমি বলেছি পাকিস্তান নামে কোনও দেশের অবস্থান নেই যা আছে তা হলো এক কল্পনা। মানচিত্রে একটা দেশ আছে বটে, কিন্তু অনেক আগে থেকেই এটা আর কোনও দেশ নয়। এর কোনও নির্ভরযোগ্য সরকার নেই, নির্ভরযোগ্য প্রকাশন, আইন এবং সংবিধান বলেও কিছুই নেই। কেউ কেউ বলে এটা এক ব্যর্থ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র সরকারবিহীন, রাষ্ট্রপতিবিহীন এবং সেনাবাহিনী কেবল নামে রয়েছে। সেখানে সেনার বদলে রয়েছে

কিছু ঠগ, খুনে, লুটেরা। কেবল ভগবানই জানেন কে এই রাষ্ট্র শাসন করছে আর অর্থ-ই বা কে জোগান দিচ্ছে।

মূলত আমেরিকা অর্থ পাঠাচ্ছে ওই দেশের বিপুল জমি ব্যবহার করে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালাবার জন্য। পাকিস্তানকে ওয়াশিংটন তাদের ট্যাংক, জিপ, সাঁজোয়া গাড়ির রাখার পার্কিং স্পেস হিসেবে ব্যবহার করছে। যখন এই সেনা গাড়ি দেশে ফিরবে, আমেরিকা তার হাত সেখান থেকে তুলে নিলেই পাকিস্তান তালিবানদের টার্গেট হয়ে যাবে আর তালিবানরা আঘাত হানবে পর্বতের আড়াল থেকে। আর তখনই এই দেশটার আর অস্তিত্ব থাকবে না, পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সাফ হয়ে যাবে।

আফ্রিকার কঙ্গো বা সোমালিয়ারকে যদি দেশ হিসেবে গণ্য না করা হয়, তবে তার সেনাবাহিনীকেও সেনা হিসেবে গণ্য করা যাবে না— এটা এক গুণ্ডাবাহিনী গুণ্ডা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেমনটা দেখা যায় লাতিন আমেরিকায়। সম্ভবত, এরা আই এস আই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যারা কিনা সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে কেউ জানে না কার নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তান চলছে। আমরা কেবল জানি লুটের টাকা বিদেশী ব্যাঙ্কে চালান হচ্ছে আর সেই টাকা যত্রতত্র চালান যাচ্ছে।

আমরা এমন একটা দেশকে নিয়ে অযথা শোরগোল তুলছি কেন? ক্রিকেট খেলাতে ভুলে যাই। আমরা সেদেশে আমাদের দূতাবাস কেন খুলে রেখেছি আর এটাও বোধগম্য হয় না। কেনই বা ওদেশের দূতাবাস এদেশে খুলতে দিয়েছি প্রকৃত একটি দেশের মতো? যাইহোক, চল্লিশ বছর আগে নারকেলের খোলের মতো দেশটাকে দু-টুকরো করে দিয়েছি আমরা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। আর যদি আমরা মনে করি তো পুনরায় তা করে দেখাতে পারি এবং আমি নিশ্চিত এরকম একটা ঘটবে খুব শীঘ্রই। আমরা এর বদলা নেব তাদের বিরুদ্ধে যারা সেনার বেশে বর্বরোচিতভাবে আমাদের দুই জওয়ানকে হত্যা করেছে।

সম্প্রতি আমেরিকা যেভাবে পাকিস্তানের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে তাতে এসবের জন্য আমার মতে দায়ী আমেরিকা-ই। সত্য যে আফগানিস্তানে অভিযান চালাতে সৈন্যদের গাড়ি রাখার জন্য আমেরিকা পাকিস্তানকে ব্যবহার করছে। কিন্তু এ নিয়ে হল্লা করার দরকার নেই, কেননা দেশটার অবস্থান কেবল মানচিত্রে। যেমন সোমলিয়া যেখানে সরকার নামের কোনও বস্তুর অবস্থান নেই, কেবল সেদেশ চলছে মার্কিন দৌলতে, তেমনিই কিছু বোকা মানুষের বদান্যতায় আফগানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অযথা গুরুত্ব পাচ্ছে পাকিস্তান যে কেবল সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল।

এইসব সন্ত্রাসবাদীরা চতুর, মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অস্ত্র শাণাচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে, ভারতকেই এই মার্কিনি বদান্যতার মাশুল গুনতে হচ্ছে। মার্কিনিরাই এশিয়া, আফ্রিকা দহনে সহায়তা করছে তাদের দুনিয়ায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতেই। এরা ইরাক বা আফগানিস্তানে অশান্তির কারণ তৎসহ এশিয়ার অন্যত্রও। সার্বিকভাবে আমেরিকাই দায়ী পাকিস্তানকে বর্বর করে তুলতে।

আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি পাকিস্তান দূতাবাস বন্ধ করে দিতাম। স্যুট-টাই পরিহিত দূতকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিতাম সূর্যাস্তের আগেই এবং ওই বাড়িটিকে ব্যবহার করতাম আমাদের জওয়ানদের হাসপাতাল হিসেবে। ঠিক এইভাবেই আমরা পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে পারি।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

বাংলাদেশের ঘাঁটি থেকে ভারতে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সন্ত্রাসবাদীদের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। সেখানেই তৈরি হচ্ছে ভারতে নাশকতার নীল নকশা। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের (আই এম) নেতারা ঘুঁটি সাজাচ্ছে বাংলাদেশে বসেই। প্রতিবেশীরাষ্ট্র থেকে সক্রিয় নেটওয়ার্ক। বেশ কিছু ই-মেল এবং স্যোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে নজরদারি চালিয়ে গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন, সেদেশে গা ঢাকা দিয়ে থাকা কয়েকজন জঙ্গি জাল বিছোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। এই তালিকায় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নেতা ইয়াসিন ভাটকলও ছিল। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং মালদার থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। নজরদারি শুরু হয়েছে কয়েকটি সংগঠনের উপর। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আড়ালে থেকে এরা মুসলিম জঙ্গীদের মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি এখন প্রায় মুছে গিয়েছে এদেশে। গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, সিমির সমর্থকরাই গড়ে তুলেছেন ‘পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া’ (পি এফ আই)।

রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের অফিসাররা বলেছেন, রাজ্যের চারটি জেলায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এই সংগঠন বেশ সক্রিয়। একই সঙ্গে নাগরিক সুরক্ষা সমিতি নামে এক সংগঠনের সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য এসেছে। গোয়েন্দারা আরও কয়েকটি সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ে চিন্তিত। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কথা বলে কয়েকটি সংগঠন গ্রামাঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কর্ণাটকে জন্মানো ইয়াসিন ভাটকল সম্পর্কে পাওয়া তথ্য থেকে চিন্তায় গোয়েন্দারা। কেননা বাংলাদেশে বসেই সে এদেশে আই এমের ভালো সংগঠন তৈরি করেছে বলে খবর। গোয়েন্দারা নিশ্চিত, সেচ্ছাসেবী সংগঠনের ছাতার তলায় থেকেই কিছু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে। সিমি এখন সরাসরি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের হয়ে কাজ করছে। তাদেরই লোকাল শাখা হিসেবে রয়েছে এই জনদরদী এন জি ও-গুলি। তারা এরাজ্যের মূলত গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উন্নয়নের কথা বলে মানুষের মন পাওয়ার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের কয়েকমাস পর থেকে মুর্শিদাবাদ, মালদা, হাওড়া, নদীয়া এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় কিছু সন্দেহজনক এন জি ও-র জন্ম হয়েছে। মুসলিম সমাজের উন্নয়নের নাম করে তারা সংগঠিত হচ্ছে। এমন কি আগামীদিনে আরও সংগঠিত হয়ে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে। এব্যাপারে তারা কোথাও শাসকদল এবং কোথাও বিরোধীদলেরও সহায়তা পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, দিল্লী, মুম্বাই, পুণে, হায়দরাবাদের অন্তত ১১টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের জন্মদাতা আমিররেজা খান, আসিফরেজা খানের শহরে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে তার বহু উত্তরসূরী। কলকাতার বেনিয়াপুকুরের ছেলে যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে, সেই সংগঠনের পিছনে থেকে মদত দিচ্ছে রাজ্যেরই কিছু মাতব্বর। জেলায় জেলায় এই সংগঠনের জাল বিছোতে এরাই উদ্যোগী হয়েছে।

ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই,

WANTED DISTRIBUTOR

ময়লার চরম শত্রু কাপড়ের পরম বন্ধু

গ্লোবাল ফাইটার

প্রতিনিধিবিহীন এলাকায়
ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

মোবাইল নং-০৩৩-৩২৬১০৩৪৫,
৯৬৮১৬০০৯৭৫

বিভিন্ন রাজ্যে ছোট ছোট মুসলিম দল জোট বাঁধছে

প্রদীপ্ত দত্ত॥ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০১২-তে প্রণবপুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় খুব কম মার্জিনে জয়ী হয়। ভোটের মার্জিন কমে যাওয়ার কারণ স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাংলায় তিনটি মুসলিম দল জোটবদ্ধ হয়ে ভোটে লড়াই করে।

ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া (যাকে সহযোগিতা করে জামাত-এ-ইসলামি হিন্দ ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া) জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটে ৪ শতাংশের বেশি ভোট পায়। এই কেন্দ্রে ৬০ শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার। কংগ্রেস হারিয়েছে ১৬ শতাংশের মতো ভোট এবং সিপিএম হারিয়েছে ২ শতাংশের মতো ভোট। ঘটনা হলো, ভোটের ফলাফল নয়, মুসলিম দলগুলি জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়াইতেই আকাশে কালো মেঘের ছায়া দেখছেন ওয়াকিবহাল মহল।

শুধু বাংলাতেই নয় বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের রাজনীতিতে ছোট ছোট মুসলিম দলের উত্থান ঘটেছে। যেমন বদরউদ্দিন আজমলের 'অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এ আই ইউ ডি এফ) ওয়াসি ভাইদের 'অল ইন্ডিয়া মজলিসি-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিম' (এ আই এম আই এম), ডাঃ আয়ুব মহম্মদ খানের পিস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (পি পি আই) প্রভৃতি। শেষ কয়েকটি নির্বাচনে ছোট মুসলিম দলগুলি যেমন পিস পার্টি, ডব্লউ পি আই এবং এস ডি পি আই ভালো ফল করেছে। ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে এই দলগুলির।

গত বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার ভোটে 'কোয়ামি একতা দল' ইত্তেহাদই মিলাদ কাউন্সিল এবং ন্যাশানাল লোকতান্ত্রিক পার্টি গঠন করেছে ইত্তেহাদ ফ্রন্ট! সঙ্গে ছিল পিপিআই। বিধানসভার সবকটি কেন্দ্রেই তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

এছাড়াও আসামে এ আই ইউ ডি এফ, তামিলনাড়ুতে তামিল মুসলিম মুনেত্রা কাজাগম,বাংলায় পিপলস ডেমোক্রেটিক কাউন্সিল কেরলে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিগ। বিহারে ডেমোক্রেটিক সেকিউলার পার্টি। এবং অন্ধ্রে এ আই এম আই এম দ্রুত শক্তি অর্জন করার চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ জয়মুর্গ মনে করেছেন, এই দলগুলির উত্থানের পেছনে একটাই কারণ— মুসলিম জনসমাজ বিশ্বাস করছে তাদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা দিতে পারে এই দলগুলিই। ধর্মনিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দলগুলি মূলত তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করছে।

ডব্লউ পি আই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ জাফারুল ইসলাম খান মনে করেন এই মুহূর্তে যে সব মুসলিম বিভিন্ন দলের হয়ে লোকসভায় ও বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করে, তাঁরা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির পুতুল মাত্র। মুসলিম উন্নয়নের ইস্যু নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

হিন্দাল আহমেদ (অ্যাসোসিয়েট ফেলো সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ ডেভলপমেন্ট সোসাইটি)-এর বক্তব্য, মুসলিমদের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলি তুলে ধরা ও আন্দোলনের জন্য মুসলিম নেতৃত্বের উত্থানের দরকার।

পি পি আই-এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ মহম্মদ আয়ুব আনসারির মতে, মুসলিমদের প্রতি সরকারের অবিচারের কারণেই ছোট ছোট মুসলিম দলগুলির উত্থান ঘটছে ও জোটবদ্ধ হচ্ছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক ও স্থানীয় বিষয়গুলি নিয়েই এই মুসলিম দলগুলি নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে নিজেদের ভিত শক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন অসমে বদরুদ্দিন আজমল অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে মুসলিমদের অনেকটাই সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরেছেন। বাংলায় এস ডি পি আই মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য নয়, মুসলিম বোধে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ওয়েলফেয়ার পার্টি আজমগড়কে তাদের শক্ত ঘুঁটি বানাবার চেষ্টা করছে। ওয়াসিভাইরা আবার ভাগ্যলক্ষ্মী মন্দিরের ইস্যু নিয়ে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

এই প্রবণতা ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এই ছোট ছোট মুসলিম দলগুলিকে একটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আসার চেষ্টা চালাবে। যাতে মুসলিম দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির দ্বারা চালিত না হয়ে নিজেরাই ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে পারে। আর এই আশঙ্কাতে এদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিপদ গুণছেন। কেননা ভারতের যেসব প্রান্তে মুসলিমরা সংগঠিত হয়েছে, সেখানেই বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিয়েছে এবং পরিণামে তা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন দেশের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম পাঞ্জাব সিন্ধু হয়েছে পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ হয়েছে সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশ। কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতরা এখন নিজভূমেই পরবাসী। অসম অগ্নিগর্ভ।

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

অন্য হিটলার

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

নাৎসী নেতা হিটলারের পরিচয় তিনি বলদর্পী, তিনি যুদ্ধবাজ, তিনি ইহুদী বিদ্বেষী, তিনি ধ্বংসের দেবতা, তিনি শুধু জার্মান জাতি ছাড়া আর অন্য কোনও জাতির পৃথিবীতে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকারী বলে মনে করতেন না। কিন্তু আমরা জানি না হিটলারের আরেক পরিচয় ছিল, যেমন, তিনি প্রচণ্ড রকমের পড়ুয়া। শিল্প, সাহিত্য রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ববিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান জগতের বহু ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। সেই সঙ্গে তাঁর ভাবনার প্রসার ছিল বিস্ময়কর। সৌভাগ্যক্রমে অনুগামীরা অনেকে তাঁর মতামত লিখে গেছেন গ্রন্থ আকারে। সেগুলির একটি হলো 'হিটলারস্ টেবল টক : ১৯৪১-১৯৪৪' যার ইংরেজী অনুবাদক নরমান ক্যামেরন ও আর এইচ স্লেভেনস। এই গ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ হিটলারের কিছু বক্তব্য নীচে তুলে ধরছি।

'যে মানুষ ইতিহাস পাঠবিমুখ সে যেন কালা ও অন্ধ। তার বেঁচে থাকা অর্থহীন।' (পৃ. ৫৭)। 'আমি ভীষণ যুদ্ধ করতে ভালবাসতাম'। (পৃ. ১৪) 'ইংল্যান্ড ও আমেরিকা একদিন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এবং সে যুদ্ধ হবে ভয়াবহ। যার ফলে একজন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হবে'। (পৃ. ১৪) 'মানুষ তার বংশধরদের মধ্যে দিয়ে কাজ করে আনন্দ পায়। আমি যখন শিশুদের দেখি তখন আমার মনে হয় ওরা আমার সন্তান। একেবারে আমার নিজের'। (পৃ. ১৭) 'সমরনায়কের কল্পনা ও দূরদর্শিতা থাকা চাই'। (পৃ. ৫৬)

'আমাদের দুটি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে— এক, সমস্ত প্রতিভাবান যুবক-যুবতী যেন রাষ্ট্রের ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে; দুই, যেন ওদের জন্য সব দরজা খোলা থাকে'। (পৃ. ৪৫) 'ইস্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা না দিয়ে টাইপ শেখালে ভাল হয় না?' (পৃ. ৭৫) 'প্রাচীন সভ্যতা এত পবিত্র, এত উজ্জ্বল, এত প্রশান্ত ছিল কারণ সে সময় দুটি মারণ জিনিস মানুষের অজানা ছিল : একটা বসন্ত রোগ অন্যটা খৃস্ট ধর্ম'। (পৃ. ৭৫) 'ইহুদি রাষ্ট্র তৈরি করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য'। (পৃ. ৮৭) 'যাদের মাঝারি রকমের প্রতিভা আছে তাদের জন্য সিভিল সার্ভিসই উপযুক্ত'। (পৃ. ১১৯) 'এই পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত নিরামিশাষীরাই বেঁচে থাকবে'। (পৃ. ১২৫)

'আমাদের জার্মানদের শক্তির উৎস বিস্ময়কর। আমাদের কর্তব্যবোধ গভীর। এমনটি অন্য কোনও জাতির নেই'। (পৃ. ১৩৫) 'জার্মানি হলো চিন্তাশীল জাতির দেশ'। (পৃ. ৩৫৭) 'জাপানিরা একের পর এক দ্বীপ অধিকার করছে। ওদের অস্ট্রেলিয়া দখল করা অসম্ভব নয়। এই সব অঞ্চল থেকে সাদা চামড়ার মানুষ বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে'। (পৃ. ১৫০) 'আমেরিকানদের চেয়ে গাধা আর কোনও জাত নয়'। (পৃ. ১৭৯) 'আমি মনে করি না জাপানীরা ভারত দখল করবে। ওরা ভারতকে ঘিরে রাখবে'। (পৃ. ২০২) 'এটা আজ পরিষ্কার যে ভারতের মানুষ আজ আর ইংরেজদের অধীনে থাকতে চায় না'। (পৃ. ৩৭০) 'আমি মনে করি ভার্সাইয়ের সন্ধির সব ধারাই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর'। (পৃ. ২২৪)

'আমি মেয়েদের রাজনীতি করা পছন্দ করি না'। (পৃ. ২৫১)

'একটি জাতির মধ্যে যদি কোনও মহামানব জন্মায় তবে সে জাতি ভাগ্যবান'। 'একজন মহামানব একটি দেশের হাজার লক্ষ অর্থ ভাণ্ডারের সমান'। 'এক মহামানব সে দেশের আত্মার বাঙ্ময়'। (পৃ. ২০৬)

'আমি ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখার পক্ষে'। (পৃ. ৩৬২) 'ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাই যে বিজয়ীরা তাদের বিজিতজাতিদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমি তাই বিজিতদের নিয়ে আত্মরক্ষা বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী তৈরি করার বিপক্ষে।' (পৃ. ৪২৫)

'আমি কখনও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হত্যা সমর্থন করিনি। এই পদ্ধতি নিষ্ফল। বিশেষ ক্ষেত্রে হত্যা চলতে পারে। বলতে কি এই পদ্ধতিতে কোনো বড় রকমের লাভ হয় না। হ্যাঁ যে ব্যক্তিকে হত্যা করব সে যদি একটি প্রতিষ্ঠানের মাথা হয় তবে এটি চলতে পারে। অবশ্য এমন ক্ষেত্রেও আমি হত্যা করা থেকে বিরত হয়েছি।' (পৃ. ৩৯০)

'আমাদের রক্তে আমি বিদেশীদের রক্ত মেশানোর বিপক্ষে'। (পৃ. ৫৪৫)

'আইন খুব শক্ত হবে না, আবার নরমও না'। (পৃ. ৬৪১) 'বহু ভাষায় কথা বলার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই'। (পৃ. ৬৮৯) 'গবেষণার কাজে সরকারি বাধানিষেধ থাকা উচিত নয়'। (পৃ. ৭১৯)

'আমি শুচিবাইগ্রস্ত লোকের চেয়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ ঘণ্টা মদ খেয়ে পড়ে থাকা জানোয়ারকে পছন্দ করি। যে লোক অপব্যয়ী, যে বয়স্ক লোক প্রচুর পরিমাণে মদ আর সিগারেট খায় আমি তাকে ভয় করি না, ভয় করি ড্রয়িংরুমে বাস করা সাধুর মতো জীবনযাপনকরা সেই বলশেভিককে'। (পৃ. ২৮৯)

'শুধুমাত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং আরব শাসনাধীন স্পেন সংস্কৃতির উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। শেষেরটির ক্ষেত্রে সভ্যতা অভাবনীয় স্তরে উন্নীত হয়েছিল। স্পেনে জন্মেছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, জোতির্বিদ, গণিতজ্ঞগণ। আর পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল সুমধুর সহনশীলতা ও বীরত্ববোধ। খৃস্টানদের আগমনের সঙ্গে বর্বর যুগের সূচনা হলো'। (পৃ. ৬৬৭)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ আয়োজিত

২২তম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন

তারিখ ঃ ২৪ মার্চ ২০১৩/রবিবার
(সকাল ৮-৩০—বিকাল ৪-৩০)

স্থান ঃ কেশব ভবন

৯এ, অভেদানন্দ রোড (বিডন স্ট্রিট)
মানিকতলা, কলকাতা-৬
শুল্ক ঃ ২০০ টাকা

যোগাযোগ ঃ কেশব ভবন (স্বাগত বিভাগ)
(বিকাল ৪টা—সন্ধ্যা ৭টা)

ডাঃ পি. কুণ্ডু	—	৯৮৩১৪৯১৬৫৮
ডাঃ এন. অধিকারী	—	৯৮৩১৭১০৭৪৪
ডাঃ এ. চৌধুরী	—	৯৬৪৭৬৫৬২৪৫
ডাঃ বি. ঘোষরায়	—	৯০৬২০৩৪৮৯১
ডাঃ জে. কুণ্ডু	—	৯৪৩৩৮২০১৮৫

হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্ম জগৎ নানা রুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য স্বরূপ দেবত্ব বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন— আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

(বাণী ও রচনা, ১/২৬)

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার কুমারসভার শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠকে ‘বিবেকানন্দ সেবা সম্মান’

শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠের মৃগানন্দজীর হাতে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে। ছবিতে বাঁ দিক থেকে— যুগলকিশোর জৈথলিয়া, শ্যামল কুমার সেন, কৃষ্ণবিহারী মিশ্র প্রমুখ।

সংবাদদাতা॥ সামাজিক সেবাকাজে নিয়োজিত শ্রী সত্যানন্দ মহাপীঠকে ‘বিবেকানন্দ সেবাসম্মান’ প্রদান করলো কলকাতা শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার মহাজাতি সদনের এনেক্স সভাগৃহে মহাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী মৃগানন্দজী মহারাজের হাতে সংস্থার তরফে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৃষ্ণবিহারী মিশ্র ও যুগলকিশোর জৈথালিয়া প্রমুখ।

এবারই প্রথম ব্যক্তির বদলে কোনও সংস্থাকে এই সম্মান দেওয়া হলো। সম্মান গ্রহণ করে মৃগানন্দজী মহারাজ বলেন— ‘এই সম্মান আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা’। এছাড়াও তিনি দিব্য ও শুভ সংস্কৃতির বিকাশে ধর্মাশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি জানান— ‘আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে কেন্দ্র করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়।’ ডাঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র তাঁর ভাষণে হিন্দুত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দের উত্তরপাড়া ভাষণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন— ‘বেদান্তই ভারতীয় দর্শন, আর সেটাই হিন্দুত্ব’। এই দর্শন তথা ভারতকে পূর্ণ করতে তিনি বুদ্ধ-শঙ্করাচার্য সহ ভারতীয় মনীষীদের সব অনুগামীকে এক হওয়ার আহ্বান জানান।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

মালদহে বইমেলায় সংস্কার ভারতীর অনুষ্ঠান

গত ২১ জানুয়ারি মালদহের ২৪ তম বইমেলার মূল মঞ্চে অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর মঞ্চে সান্ধ্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উদ্বোধনী সংগীত সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করে মালদহ সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। প্রথম নিবেদন ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষে স্বামীজীকে নিয়েই একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি সংগীত। কথা ও সুর সংস্কার ভারতীর মালদা শাখার সদস্য তাপস চক্রবর্তীর।

দ্বিতীয় নিবেদন ছিল কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে একটি দ্বিজেন্দ্রগীতি— 'বেলা বয়ে যায়'। অংশগ্রহণে ছিলেন— তন্দ্রা পাল, বেবী বাগচী, সুমিতা ভট্টাচার্য, সুদীপ্তা দাস, রুমা দে, সঞ্চিতা রাণা, সঙ্গীতা দে, সজল দত্ত, তাপস চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্র সরকার ও বিনয় চৌধুরী। তবলায় সহযোগিতা করেছেন— সুব্রত সরকার। সংস্কার ভারতীর এই গান দুটি বইমেলায় দারুণ সাড়া ফেলেছে।

রূপনারায়ণপুরে প্রণব হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব

গত ২০ ও ২১ জানুয়ারি বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুর হিন্দুস্থান কেবলস্ স্থিত শ্রীশ্রী প্রণব হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে শোভাযাত্রা, স্বামী প্রণবানন্দজীর প্রতিকৃতি সহকারে অভিষেক বারি আনয়ন, হিন্দু ধর্ম সম্মেলন, বৈদিক শান্তি যজ্ঞ, অন্নকূট ভোগ প্রসাদ বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, বাউল গান পরিবেশন করেন প্রণব বাউল সম্প্রদায়ের শিল্পীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে একুশজন ভক্ত স্বামী ধ্যানেশানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্ম সম্মেলনে বেলডাঙ্গা সেবাশ্রম সঙ্ঘের তাত্ত্বিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী সকল হিন্দুকে দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক ভেদ ভুলে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে পরিমল কর্মকার, অশ্বিনী কামিল্যা, পার্থ রায় সরকার, উজ্জ্বল মিশ্র, কৃষ্ণা রায় প্রমুখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মেদিনীপুরে মধুসূদন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস

১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন হলো গত ৭ ফেব্রুয়ারি। ওই লাইব্রেরির সভাঘরে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হিসাবে। লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক নব বন্দ্যোপাধ্যায় এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁরা ছিলেন (১৯১৫) তাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সমর দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্ব ও বরেণ্য ব্যক্তিদের লাইব্রেরিতে পদার্পণের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সঞ্জীব সাংঘী (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট)। ওই লাইব্রেরিতে এপ্রিল মাস থেকে কমপিউটার শিক্ষা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

শোকসংবাদ

গত ১৯ জানুয়ারি বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অমিয় মাধব চট্টোপাধ্যায়-এর তৃতীয় পুত্র মনোজিৎ (২৭) খড়গপুরে একটি স্টিল প্ল্যান্ট-এ কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। খড়গপুর থেকে

কলকাতায় একটি নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে ২০ জানুয়ারি তার মৃত্যু হয়। মনোজিৎ সঙ্ঘগীতে পারদর্শী, ঘোষবর্গের একজন ভাল বংশীবাদক ছিল এবং গত যুব শিবিরেও উপস্থিত ছিল। মনোজিতের এই মর্মান্তিক অকাল মৃত্যুতে বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবকরা ও তার পরিবার শোকস্তব্ধ। তার পিতা সকলের প্রিয় 'মাধুদা' স্বস্তিকার প্রচারে দীর্ঘ কয়েক বছর স্বস্তিকার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

***

সঙ্ঘের আসানসোল মহকুমা সঙ্ঘচালক লক্ষ্মণলাল গুপ্তের স্ত্রী গত ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর তিন পুত্র ও চার কন্যা। সকলেই সঙ্ঘ কাজের সঙ্গে যুক্ত। সকল স্বয়ংসেবক ও প্রচারকদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমতা ছিল অপরিসীম। শেষদিন পর্যন্ত তিনি স্বয়ংসেবকদের পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

***

সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার রাজপুত তেঘরী শাখার স্বয়ংসেবক শ্যামল কুমার সিংহরায় গত ২৫ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। ৪৯ বছর বয়স হয়েছিল। প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা প্রাপ্ত স্বয়ংসেবক। ব্যক্তিগত জীবনে উকিল ছিলেন। বাবাও বিশ্বহিন্দু পরিষদের জেলার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। রেখে গেছেন মা, বাবা, স্ত্রী ও পুত্রকে।

মঙ্গলনিধি কার্যক্রম

গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০১২ বর্ধমান জেলার বেলগ্রামের স্বয়ংসেবক ডাঃ পলাশ পালের শুভ বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ পঙ্কজ মণ্ডল ও বর্ধমান জেলা প্রচারক পরিতোষ দে এবং জেলার প্রমুখ কার্যকর্তারা।

শোক-সংবাদ

পরলোকে সন্তোষ কুমার বিশ্বাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলার পলাশী শাখার স্বয়ংসেবক এবং ওই জেলার কার্যকারিণী সদস্য সন্তোষ কুমার বিশ্বাস গত ১০ ফেব্রুয়ারি রবিবার রাত্রে নিজস্ব বাসভবনে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হিন্দুত্ববাদী ও সমাজসেবী ছিলেন। তিনি অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।

সমীর কুমার রায়-এর সংযোজন : সবার প্রিয় সন্তোষ-দা (সন্তোষ কুমার বিশ্বাস) নিজেই শয়ন করলেন ভারতমাতার কোলে যেন ছোট্ট শিশুর মতন। সমাজ এবং রাষ্ট্রের সেবার জন্যেই ঈশ্বর যেন তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন তরুণ, সন্তোষদা তখন যুবক। একই পাড়ায় (নদীয় জেলার পলাশীতে) বসবাস করি। সুতরাং খুব কাছ থেকেই তাঁকে দেখি। তিনি পরিশ্রমী, অদম্য মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর দাদা সমীর বিশ্বাস এশিয়া খ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি ইচ্ছা করলে কলকাতায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি বিবাহ না করে গ্রামেই থেকে গেলেন। গ্রামের মানুষকে সেবা করার জন্যে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েও জীর্ণ কুটিরে সমাজের নিচুতলার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিলেন। পাড়ায় বন্যার জল ঢুকছে— সন্তোষ-দা বেরিয়ে পড়লেন ঝুড়ি কোদাল নিয়ে বাঁধ দিয়ে পাড়াকে রক্ষা করতে। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, বিদ্যুৎ আনতে হবে— সন্তোষ-দা বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে এলেন। কারও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কারও টাকার অভাবে লেখাপড়া হচ্ছে না— সন্তোষ-দা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। দাদা ডাক্তার ছিলেন। সেই সূত্রে বহু স্বনামধন্য ডাক্তারের সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং রুগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন আমৃত্যু।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে তিনি সঙ্ঘের শাখা শুরু করেন পলাশীতে। সেই সময় পলাশীতে হিন্দুদের যে দুরবস্থা ছিল সঙ্ঘের শাখা স্থাপনের ফলে তা কিছুটা দূর হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সম্পর্কে আসার পর শাখা বৃদ্ধির জন্যে তিনি আমৃত্যু অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। বাংলার বহু স্বয়ংসেবক, বিশেষ করে নদীয়া জেলার করিমপুর থেকে কল্যাণীর এমন কোনও স্বয়ংসেবক নেই যিনি সন্তোষদাকে চিনতেন না।

প্রত্যেক স্বয়ংসেবক পরিবারের সঙ্গে সন্তোষদার আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তিনি প্রত্যেকদিন শাখায় উপস্থিত থাকতেন। শাখায় উপস্থিত থেকে দৈনিক প্রার্থনা করা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। মৃত্যুর আগের দুই মাস চিকিৎসক তাঁকে হাঁটা চলা করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই নিষেধ উপেক্ষা করে গয়েশপুরে সঙ্ঘের বিবেকানন্দ যুব শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেটাই তাঁর জীবনের শেষ সঙ্ঘের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। তাঁর আরও একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ছোট বড় সবাইকেই প্রণাম করতেন। আজ আমরা সকলে তাঁকেই প্রণাম জানাই।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— সঃ স্বঃ

ডঃ নজরুল ইসলাম রচিত

মুসলমানের করণীয় পুস্তকের জবাবে

হিন্দুর করণীয়

নিত্যরঞ্জন দাস

মূল্য ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনসূচী-২০১৩

ভ্রমণ	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য		
			প্রাপ্তবয়স্ক	বালক/বালিকা ৫-১১ বৎসর	শিশু ২-৪ বৎসর
উত্তর ভারত (দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বার-দিল্লি-মথুরা-বৃন্দাবন-আগ্রা)	১২	১৫ই মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
কাশ্মীর (অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ)	১২	২৮শে মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
গ্যাংটক-নামচি-পেলিং	৮	১৭ই এপ্রিল,২০১৩ ২২শে মে,২০১৩	৭,০০০/-	৫,৫০০/-	২,০০০/-
দার্জিলিং-গ্যাংটক	৮	২৩শে মে,২০১৩	৬,৮০০/-	৫,১০০/-	১,৭০০/-
সিমলা-কুলু-মানালী	১১	৯ই মে,২০১৩	৯,৫০০/-	৭,৩০০/-	২,৪০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেন/লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং।

প্যাকেজে থাকছে না :- এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

‘ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি’

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে ?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

রঙ্গম

যাত্রা উৎসব : দু-চার কথা

বিকাশ ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতায় থাকার সুবাদে এই প্রতিবেদকের যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা মার্কাস স্কোয়ারে ‘বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন’-এ। তখন বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পর পর একই মঞ্চে দেখা যেত। ওখানেই প্রথম ব্রজেন্দ্র কুমার দে, ক্ষীরোদ নট্ট, বড় ফণীকে দেখি। আঙ্গুরবালা- ইন্দুবালার গান শুনি। বহুরূপীর রক্তকরবী দেখি। যেটা গত শতকের পঞ্চাশ দশকের কথা। নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে তখন বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে দু-একটি যাত্রাপালাকেও দেখা যেত।

অনেক যাত্রাদলকে একসঙ্গে নিয়ে দু-সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ ধরে যাত্রাপালার আয়োজন অর্থাৎ এককথায় ‘যাত্রা উৎসব’ কলকাতায় প্রথম শোভাবাজার রাজবাড়িতে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর ‘নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসব’— এই নামে অনুষ্ঠিত হয়। একেবারে যাত্রার পরিবেশে। অর্থাৎ মাঝখানে মঞ্চ। তাকে ঘিরে দর্শকমণ্ডলী। মাথায় ঝাড়লণ্ঠন। একেবারে সাবেকী যাত্রার আসর। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। চলেছিল দু-সপ্তাহ। মনে আছে প্রথম উৎসবে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল দেখার মতো। রীতিমত লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হয়েছিল। শেষদিন ছিল কম্বিনেশন নাইট। ‘বাঙালি’ পালায় অভিনয় করেছিলেন যাত্রাজগতের স্টার আর্টিস্টরা।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হবে। এই যে ‘নিখিল’ বঙ্গ যাত্রা উৎসব’, এর রূপায়ণে ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এক যাত্রাপ্রেমী যুবক প্রবোধবন্ধু অধিকারী। আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করতেন। মূলত, এঁরই উদ্যোগে আনন্দবাজার সপ্তাহে একদিন যাত্রার জন্য একটা পাতা বরাদ্দ করেছিল। এই সময় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে রাসবিহারী সরকার

প্রতি শনিবার ম্যাটিনী শো-তে সেরা যাত্রাদলগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মূলত, রাসবিহারী সরকারের প্রচেষ্টায় কলকাতার বিডন স্কোয়ারে আরও বৃহত্তর আয়োজনে ‘যাত্রা উৎসব’-এর ব্যবস্থা হয়। দর্শকাসনও অনেক বেড়ে হয় প্রায় সাড়ে চার হাজার। সকলের শোনার সুবিধের জন্য মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা হয়। দর্শকদের দ্রুত পরিবর্তনশীল রুচির প্রয়োজনে আলোক সম্পাতের প্রয়োগেও সময়োপযোগী পরীক্ষায় এগিয়ে এলেন তাপস সেন। শেষ পংক্তির দর্শকও যাতে অভিনেতার অভিব্যক্তি দেখতে পান, তার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। সবদিক থেকে বিডন স্কোয়ারের ‘যাত্রা উৎসব’ প্রাচীন যাত্রাপালাকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে আমাদের সামনে তুলে ধরল। ছুটির দিন দুপুর থেকে পরপর তিনটি দলের অভিনয়ও হয়েছে। একটু বয়স্ক যাঁরা তাঁদের হয়ত মনে আছে, সমগ্র দেশবাসীর সামনে জাতীয় সংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই সময় সংবাদপত্রে ৯৭ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর একটি আবেদনও প্রচারিত হয়। গ্যালারির দর্শনী দৈনিক মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। অন্য আসন ১ টাকা থেকে ৭ টাকা। সিঙ্গল টিকিট ৩৫ থেকে ১০০ টাকা। বিশেষ বিশেষ দিনে টিকিট না পেয়ে দর্শকদের ফিরেও যেতে হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সরকারি ‘যাত্রা উৎসব’ ১৭তম হলেও, ‘যাত্রা উৎসব’ আজ পঞ্চাশ বছর পার করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট যাত্রা গবেষক প্রভাতকুমার দাস যাত্রা উৎসবের ধারাবাহিকতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘‘আজ পঞ্চাশ বছরের সময়কাল অতিক্রান্ত। যাত্রাকে আধুনিকতার পথে অগ্রবর্তী-বিনোদক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সেই সূচনা (১৯৬১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর)— তারপর কলকাতার যাত্রা কত বৈচিত্র্য কত সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করে, কখনও নিছক চমক সৃষ্টি করে স্খলিত, ব্রাত্য, ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে বলে যাত্রামোদীদের কাছে সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু জনজীবনের হৃদয়ের বড়ো আদরণীয় যাত্রার প্রতি সঙ্গত অসন্তোষ পোষণ করলেও— অনাদরে— উপেক্ষায় যাত্রা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। সংকটে বার বার পর্যুদস্ত হয়েও যাত্রার সঙ্গে যুক্ত সবস্তরের ব্যক্তিবর্গ তাঁদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন— বাংলার এই প্রাণের সম্পদ যেন বিস্মৃতির পথে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়ে যায়।’’

শব্দরূপ-৬৫৮ শ্রেয়সী মল্লিক

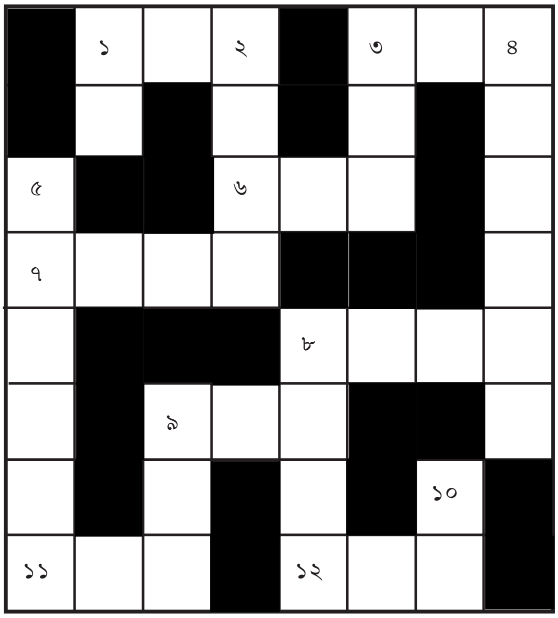

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. একপ্রকার ফুল, উপকারী বনৌষধি বিশেষ, ৩. বিশেষণে কুঁড়ে, শেষ দুয়ে ইঙ্গ ক্ষতি, ৬. বিশেষণে জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, ৭. তৎসম শব্দে পদ্ম, দুয়ে-চারে ধুলা, ৮. বিভিন্ন শিল্পে পারদর্শী, প্রতিশব্দে শিল্পদক্ষ, ৯. পৌরাণিক মুনিবিশেষ, ১১. পানের খেত, ১২. দেবী দুর্গার এক রূপবিশেষ, প্রথম ঘরে গরম পানীয়।

উপর-নীচ : ১. হিন্দি শব্দে রৌদ্র, ২. রামের অনুজ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক প্রাচীন বৈদান্তিক বিশেষ, ৩. তৎসম ব্রজ বা বাজ, ৪. হাসিযুক্তমুখী, স্মিতাননা, চারে-পাঁচে খারাপ, ৫. অন্য নামে হোলি বা দোল পরব, ৮. প্রতিশব্দে কাচ্চাবাচ্চা, ছাড়া পোনা, ছোটবাচ্চা, ৯. অসুর, দৈত্য, ১০. শীতল।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৫৫
সঠিক উত্তরদাতা

অসীম দে
সাহাপুর, মালদা
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ি, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

			ম		গ	ণ	ক
	সু	রা	হা		ও		পা
স্ব			জ	ন	ক		ল
খা	ন	খা	ন				কু
ত				অ	পো	গ	ও
স		খ	দ্যো	ত			লা
লি		লি		প	র	ম	
লে	ফা	ফা		স্ক			

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

❑ ৬৫৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ মার্চ, ২০১৩ সংখ্যায়

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH SCIENCE & COMMERCE STREAM BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR BANKURA - 722155

CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

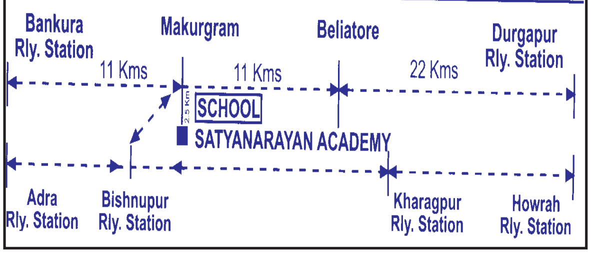

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান—১৩ জানুয়ারি, ২৭ জানুয়ারি,১০ ফেব্রুয়ারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩

ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪, ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২৯

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

SRISTI

COMPUTER SAKSHARATA MISSION

SCSM™

IT Education

An ISO 9001 : 2008 certified Organization

ভারত সরকারের দ্বারা অনুমোদিত

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য
কম্পিউটার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স

Computer Courses by SCSM

- Basic ♦ Internet
- FA ♦ D.T.P.
- Hardware
- Multimedia
- Teacher Tranning Courses
- Web Page Designing
- Video Editing& Mixing
- Mobil Reparing

100% Job Garantee Teacher Tranning Courses

সার্টিফিকেট সারা ভারতবর্ষে গ্রহণ যোগ্য।

Distance Courses

- BA, MA,
- B.Com, M.Com,
- B.Sc. , M.Sc.
- BSW, MSW
- B.Lis, M.Lis
- BCA, MCA,
- BBA, MBA
- BSc.-IT, MSc.-IT

B.ED. (Regular)

NIOS থেকে মাধ্যমিক-উচচমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

Garia, N-11, Srinagar Main Road,
Kol-700094 ♦ PH-9933967518

Computer Sales & Services

Website: WWW.SCSM.CO.IN

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
25 February - 2013

দাম : ৭.০০ টাকা